নিবেদন

কথায় বলে, রঘু আবার কাব্য, তার আবার টীকা। কিন্তু কাব্য যাহারা লিখিতে পারে না অথচ কলম-কণ্ডুয়নের ব্যাধিতে ভুগে, তাহারা অগত্যা টীকাই লেখে। ভাল কাব্যের না পারিলে 'মন্দ' কাব্যের ল্যাজ ধরিয়া সাহিত্যসাগরে সন্তরণপ্রয়াসী হয়। এক সঙ্কলন গ্রন্থে যে দেড়গজী নিবেদন জুড়িয়া দিতেছি, তাহার কারণও তাই,—অন্যাশ্রিত রচনার নৌকায় নিজের এক আঁটি তুলিয়া দেওয়া। বোঝার উপর, শাকের আঁটি বইত নয়! বোঝার ভার সহিলে আঁটির ভারও সহিবে।

মনে করিয়াছিলাম, প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে স্ব-সাহিত্য-গর্ব্বিত বাঙ্গালীরা যে উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করেন, তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া সখেদ উদারতা প্রকাশ করিব। কিন্তু সাতপাঁচ ভাবিয়া এই আত্মপ্রসাদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করাই স্থির করিয়াছি। শেষকালে ধরা পড়িয়া নাজেহাল হওয়ার চাইতে আগেই কবুল খাওয়া সুবুদ্ধি। উন্নাসিকতায় আমিও তো কম যাই না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া অপরপ্রান্তবাসিদের সঙ্গে পারস্পরিক পরিচয় ইত্যাদি উঁচুদরের গালভরা কথা আমার মুখে মানাইবে না।

তবে যে হিন্দী হইতে গৌড়জনের মৌচাকের জন্য মধ্বাভাবে গুড় বহিয়া আনিলাম, সে শুধু গরজ বড় বালাই বলিয়া।

অনেকের মত আমারও লেখক হইবার শখ চাগিয়াছিল, কিন্তু শক্তি এক আধলা পরিমিতও আছে, ইহা আজ পর্য্যন্ত শত্রু-মিত্র কেহ স্বীকার করিল না। নাকের জলে চোখের জলে কাগজ কলম সিক্ত করিতে করিতে যাহাই লিখি, বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না দেখাইয়া তাহা মুদ্রণ-

রাজ্যের কর্ত্তারা যথেচ্ছ ফেলিয়া দেন। তাই মগজ হইতে বানাইয়া লেখার দুরাশা ত্যাগ করিয়া ভুক্ত-পূর্ব্ব মালের কারবারে নামিতে হইল। নামের জোরে অনেক কিছুই কাটে। নামৈব কেবলম্ কলৌ। শুনিতে পাই শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় প্রথম-প্রথম নিজের লেখা কিছুতেই চালাইতে না পারিয়া শেষকালে স্বরচিত কবিতা অনুবাদ বলিয়া চালান। "প্রাচীন পারসীক হইতে" "প্রাচীন অসমীয়া হইতে" ইত্যাদি চিত্তদ্রাবক শীর্ষকের ইহাই নাকি ইতিহাস।

নূতন মাল পুরাতন বলিয়া আমি পাচার করি নাই বটে, কিন্তু নূতন কিছু করার মোহকে একেবারে ঠেকাইতেও পারি নাই, একাধিক ক্ষেত্রে তাহা সুপ্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ, হিন্দী রস-সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষান্তর এই প্রথম। আমার আগে কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই পুস্তকে সংগৃহীত গল্প কয়টি, ইতোপূর্ব্বে পত্র-পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রকাশ কাল: ১৩ই জুন, ১৯৪৩ সাল। স্থান: রবিবাসরীয় আনন্দবাজার; গল্পের নাম: কুমুরে পোকা।

দ্বিতীয় নূতনত্বটি কিঞ্চিৎ বিপদসঙ্কুল হইলেও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আধুনিক হিন্দী রস-সাহিত্যে কি পরিমাণ রস আছে, কি পরিমাণ গাদ, তাহা একদিন বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে। যাঁহারা হিন্দী জানেন, বর্ত্তমান গল্পগুলির মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই হাল মালুম করিতে পারিবেন। যাঁহারা এই অধীন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত উৎস হইতে কুম্ভ ভরিতে প্রবৃত্ত হইবেন (বা ইতিমধ্যেই হইয়াছেন), তাঁহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইবেন। মূল গোপন না করিয়াও যতদূর মৌলিকতা জাহির করা যায় করিয়াছি এবং পরিণাম ফলের জন্য আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি। ইতিমধ্যে হুল্লোড়ে পড়িয়া বই যদি কিছু কাটিয়া যায়,—এই যথা-লাভ।

কোন এক রকমের বিস্ফোরণ না ঘটাইতে পারিলে বই যে কাটিবে, সেই দুরাশা রাখি না। পত্রিকায় যখন বাহির হইতেছিল, তখন গল্পগুলি নিজে যাচিয়া কেহ পড়িয়াছেন, এমন তো শুনি নাই। তথাপি সম্পাদকগণ সদয় চিত্তে এইগুলি পৃষ্ঠা ভরাইবার কাজে লাগাইয়াছিলেন। এখন, পুস্তকাকারে বাহির করিবার মত অসমসাহসী প্রকাশকও ভাগ্যগুণে পাইলাম। এর পর আর, ভগবান নাই, একথা বলিতে পারিব না। হাজার হউক অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

প্রকাশক মহাশয় আমার অনুনয়-বিনয়ে কান দিয়া বড় একটা ঝুঁকি ঘাড়ে করিলেন। খরচা পোষাইবে না, ইহাই একমাত্র ঝুঁকি হইলে কথা-ছিল না। যাহা হউক, নিজ নাম ছাপার হরফে দেখিবার আমার বহু-কালের সাধ সম্পাদকমণ্ডলী ও প্রকাশক মহাশয়ের প্রসাদাৎ পূর্ণ হইল। তাঁহাদের এই সহৃদয় অনুকম্পার জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

মূল লেখকদের নিকট নিবেদন কিছুই নাই। একজন বাদ দিয়া অন্য সকলে পাকাপাকি ভাবে ঠিকানা বদল করিয়াছেন বলিয়াই আমি সুযোগ পাইয়াছি। স্বর্গে কিংবা যেখানেই থাকুন, আমাকে যদি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন, বড় বাঁচিয়া গিয়াছি মনে করিব।

নিবেদন এইখানেই ইতি।—হে পাঠক (যদি কেহ থাকেন), পরবর্ত্তী আকর্ষণ বিকর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। অদ্য রজনীই শেষ রজনী নয়—the worst is yet to be।

দেরাদুন
রবীন্দ্র-জন্মতিথি :
১৩৫৩

শ্রীনরেশচন্দ্র পাল

সূচী

ভুলি নাই

বড় বড় সহরে একাচালকদের কটুকাটব্য শুনিতে শুনিতে যাঁদের কানে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা একবার অমৃতসরে গিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগাইতে পারেন। বেনারসে, দিল্লীতে, লক্ষ্ণৌয়ে এক্কেশ্বরগণ এককালে হাত ও মুখ চালায়। ঘোড়ার সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, পথচারীদের দৃষ্টিহীনতা ও ক্ষীণতার জন্য আক্ষেপপূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে গালিগালাজ ও দ্রুত ধাবনে পাল্লা দিয়া রাজপথকে সচকিত কম্পিত করিতে করিতে ইহারা মরি বাঁচি দৌড় লাগায়। নিজের, পথিকের ও ঘোড়ার প্রাণের প্রতি লেশমাত্র দয়া মায়া নাই।

অমৃতসরে কিন্তু ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র! এক্কাও চলে এক্কেশ্বরগণের মুখও চলে, কিন্তু ভাষায় বিশেষ দরদ মাখানো। 'বাপু-বাছা' ছাড়া কথাই নাই। মুখে, বচো খালসাজী, হটো ভাইজী, টহরনা মাই, আনে দো লালাজী ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। বিচিত্র বেশ-বাস, বিচিত্রতর ব্যবসায়ী ও পথিকের ভিড় কাটাইয়া, নিজের ও অন্যের প্রাণ বাঁচাইয়া সন্তর্পণে ইহারা অগ্রসর হয়। কোন পথচারির যদি চক্ষু-কর্ণের বিশেষ অভাবও প্রমাণিত হয়, তবু ইহারা ধৈর্য্য হারায় না। মনে করুন কোন তালকানা বুড়ী সরাসরি মাঝ রাস্তা দিয়া চলিতেছে, কিছুতেই এক পাশে সরিতেছে না। তখন এক্কাওয়ালার ভাষা এই রকম হয়:—হট যা জীওন যুগিয়ে, হট যা করমাঁওয়ালিয়ে, হট যা পুত্তাঁপ্যারিয়ে, বচ্

যা লম্বী উমরওয়ালিযে, অর্থাৎ এই বুড়ি মাই, তুই এখনও অনেকদিন বাঁচবার যুগ্যি, বরাত তোর খুব ভাল, ছেলেপিলে খুব ভালবাসে, অনেকদিন এখন পরমায়ু বাকী, সরে যা রাস্তা থেকে, খামোখা গাড়ীর তলায় প্রাণটা কেন দিবি ?

এই রকম বহু একা ও এক্কাচালকগণের মধুর বাক্যবর্ষণের মধ্যে পথ করিয়া একটি ছেলে ও একটি মেয়ে গলির মোড়ে এক দোকানে আসিয়া পৌঁছিল। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ইহারা শিখ। মেয়েটি দোকান হইতে ডালবড়ী কিনিতে আসিয়াছে। ছেলেটি মামার মাথার উকুন বধের জন্য দই কিনিবে। দোকানদার এক বিদেশী ক্রেতার সঙ্গে বচসায় রত। ক্রেতা ওজন দরে পাঁপড় কিনিয়া মনোমত না হওয়ায় গুণিতে বসিয়াছে এবং দোকানদার এই দ্বিবিধ সতর্কতার প্রতিবাদ করিতেছে। কোথা হইতে এই উজবুক খদ্দের জুটিল ? এ পাই, তেরা কর কাহাঁ—অর্থাৎ এ ভাই, কোন্ দেশে তোর বাস ? পাঞ্জাবীরা যখন হিন্দী বলে তখনও 'ভ'কে 'প', 'খ'কে 'ক' বলিয়া ফেলে। বালক-বালিকা দুইটি মহানন্দে ঝগড়ার রস উপভোগ করিতেছিল। অকস্মাৎ সওদার কথা স্মরণে পড়ায় দু'জনে তারস্বরে চীৎকার করিয়া দোকানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দোকানীর স্বর তখন পঞ্চমে চড়িয়াছে। সে বালক-বালিকার কথায় কর্ণপাত করিল না। ছেলেটি তখন বালিকার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই, তোর বাড়ী কোথায় ?

—মগরায় ? আর তোর ?

—মাঝায়। এখানে এসেছিস কার কাছে ?

—অমর সিং-এর বাড়ী। অমর সিং আমার মামা।

আমিও এসেছি আমার মামার বাসায়। গুরুবাজারে থাকি।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া দু'জনে আবার দোকানীকে সওদা দিতে বলিল। দোকানী ততক্ষণে পাঁপড়-মামলার হেস্তনেস্ত করিয়া হাঁফাইতেছিল। সওদা দিয়া ছেলেমেয়ে দু'টিকে বিদায় করিল। দু'জন এক পথে চলিতেছিল। কিছুদূর গিয়া বালক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোর কুড়্মাই হয়ে গিয়েছে? কুড়্মাই অর্থাৎ বাগ্‌দান। বালিকা ধেৎ বলিয়া দৌড়িয়া পালাইল।

এর পরে প্রায় রোজই, কোনদিন দুধের দোকানে, কোনদিন শাক-সব্জীর বাজারে উভয়ের দেখা হয়। মাঝে মাঝে বালক সেই একই প্রশ্ন করে। জবাব পায়—ধেৎ।

ক্ষ্যাপাইবার জন্য আর একদিন বালক যখন জিজ্ঞাসা করিল, বালিকা অপ্রত্যাশিত উত্তর দিল, হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।

কবে?

কাল। দেখছিস্‌ নে এই রেশমের ফুলওয়ালা ওড়না? বলিয়া বালিকা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল। বালক নিজ বাড়ীর রাস্তা ধরিল। পথে এক ছেলেকে নর্দ্দমায় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, এক তিলের মিঠাই বিক্রেতার সারাদিনের উপার্জ্জন নষ্ট করিল, এক কুকুরকে ঢিল ছুঁড়িল, এক ফুলকপি বিক্রেতার ঝুড়ির মধ্যে হাতের লোটা হইতে দুধ ঢালিয়া দিল। স্নান করিয়া এক বৈষ্ণবী ঘরে ফিরিতেছিল, তাহাকে ছুঁইয়া দিয়া গালাগালি খাইল। এইভাবে গায়ের ঝাল মিটাইয়া ঘরে পৌঁছিল।

"এও কি আবার একটা লড়াই? দিনরাত নালীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পায়ে খিল ধরে গেল। লুধিয়ানার দশগুণ শীত, তার উপর বৃষ্টি আর বরফ! কাদায় কাদায় হাঁটু অবধি হেজে যাবার জো হয়েছে।

দুশমনের দেখা নেই! ঘণ্টা দু-ঘণ্টা পরে পরে এক একবার কানে তালা লাগিয়ে ব্রহ্মাণ্ড চৌচির হবার শব্দ হয়, সমস্ত নালা কেঁপে ওঠে, শ' শ' গজের মধ্যে আর কিছু আস্ত থাকে না। এই রকম আচমকা গোলার হাত থেকে বাঁচলে তবে ত লড়বে। নালীর বাইরে সামান্য একটু কনুই বা হাত বেরিয়েছে কি মরেছে। কোথা থেকে অমনি এসে লাগে গুলী। বেইমান ব্যাটারা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে নাকি?"

"লহনা সিং, আর তিনদিন বাকী। চারদিন কেটে গেছে। পরশু বদলী আসবে, তারপর সাত দিনের ছুটি। নিজের হাতে পাঁঠা কেটে রান্না চড়াব, খেয়ে আরামে ঘুম লাগাব। সেই মেম সাহেবের বাগানে মখমলের মত নরম ঘাস। আবার বুড়ী আমাদের দেখলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। দুধ-ফল দিনে দশবার নিয়ে আসে। বলে, তোমরা আমার দেশ রক্ষা করতে এসেছ, তোমরা দেবতা।"

"চারদিন চোখের পাতা এক করিনি। চলতে না পেলে ঘোড়া বিগড়ায়, লড়তে না পেলে সেপাই। সঙ্গীন চড়িয়ে মার্চ্চ করতে যদি পাই, তবে আর কিছু চাইনে। এরপর যদি সাত ব্যাটা জার্ম্মানকে না মেরে ফিরি, তবে দিল্লীর গুরু দরবারে যেন আর ভজন গাইতে না পাই। বদমাস সব—যা কিছু করবে, করাবে সব কলে। সঙ্গীন দেখলেই কলের কামানের ঘোড়া টেপে। নয় তো আঁধারে ত্রিশমুনে গোলা ফেলে। সেদিন আক্রমণ করবার হুকুম পেয়ে চার মাইলের মধ্যে এক ব্যাটা জার্ম্মানকে ছাড়িনি। জনরল সাহেব হুকুম দিলে, তাই ফিরতে হ'ল—নইলে—"

"নইলে সোজা বার্লিন পৌঁছে যেতে—কেমন?" বলিয়া সুবেদার হাজরা সিং মৃদু হাস্য করিলেন। "ভায়া, লড়াই জমাদার হাবিলদারের

বুদ্ধিতে চলে না। বড় যার দায়িত্ব, সে অনেক ভেবেচিন্তে তবে কাজে হাত দেয়। তিনশ' মাইলের লাইন। এক কোণে দু-চারশ' গজ আগে এগুলেই কি, আর না এগুলেই কি।"

লহনা সিং জবাব দিল—"সুবেদার সাহেব, বলছ ঠিক, কিন্তু করি কি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে জমে যাচ্ছি যে। সূর্য্যের মুখ দেখতে পাইনে। এদিকে নালার গা বেয়ে দু'দিক থেকে অঝোরে ধারা ঝরছে।"

সুবেদার সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"উদয় সিং, তুমি উনুনে কিছু কয়লা দাও। বজীরা সিং, তোমরা চারজন মিলে বালতী ভরে ভরে জল কাদা বাইরে ফেল। মহা সিং, তুমি খাইয়ের মুখে পাহারা বদলাতে যাও।" বলিয়া নিজেই তদারক করিতে খাইয়ের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিলেন।

বজীরা সিং বালতী ভরিয়া কাদাজল ফেলিতে ফেলিতে বলিল, —"জার্ম্মান বাদশার তর্পণ কচ্ছি।"

সকলে হাসিয়া উঠিল. হাসির হাওয়ায় অবসাদের মেঘ কাটিয়া গেল। লহনা সিং আর এক বালতী ভরিয়া বজীরা সিং-এর হাতে দিয়া বলিল, "বাদশার শ্রাদ্ধ তর্পণ তো হ'ল, এবার খরমুজের খেতে সার দাও। সারা পাঞ্জাবে এমন সার তো আর পাবে না।"

—যা বলেছ! দেশ তো নয় একেবারে স্বর্গ। আমি তো ভাবছি, লড়াইয়ের পর গভর্ণমেণ্ট থেকে দশ বিঘা জমী এখানেই চেয়ে নেব আর ফলের বাগান করব।

—দুলারীকেও নিয়ে আসবে নাকি? না ঐ দুগ্ধবতী মেম—

—চুপ কর বাপু। এদেশের লোক কেমন ধারা, লজ্জা-শরম নেই যেন, যে দেশের যে আচার। আজ পর্য্যন্ত মেমকে বোঝাতেই পারলুম না যে, শিখ তামাক-সিগারেট খায় না। সিগারেট নিয়ে ও বার বার

জিদ করবে, চুমো খেতে আসবে। পিছিয়ে গেলে দেবতা রাগ করেছেন মনে করে। ভাবে বোধহয় যে, এবার এরা রেগে মেগে দেশে চলে যাবে—আমাদের জন্য আর লড়বে না।

—আচ্ছা, এখন বোধা সিং কেমন আছে ?

—আগের চেয়ে ভালই।

—থাকবে না কেন। রাত ভোর তুমি তো নিজের কম্বল দু'খানি ওর গায়ে চাপিয়া নিজে শীতে ঠক ঠক করতে থাক। উনুনের পাশে বসে কি এই শীত কাটতে পারে ? ওর পাহারার সময় তুমি পাহারা দিচ্ছ, নিজের শুকনো তক্তায ওকে শোয়াচ্ছ, নিজে জল-কাদায় দাঁড়িয়ে আছ। শেষকালে অসুখে পড়ে মরবে আর কি ! শীত তো নয় যেন কাল। নিউমোনিয়া হতে কতক্ষণ ?

—আমার জন্য ভেবো না ভাই, আমার কপালে দেশে মরণ আছে। ভাইয়ের কোলে মাথা থাকবে, উপরে থাকবে আম-গাছের ছায়া—যে আমগাছ নিজের হাতে অঙ্গনে লাগিয়েছি।

বজীরা সিং ক্রুদ্ধ হইয়া ধমক দিয়া বলিল, কি সব অলক্ষুণে কথা হচ্ছে ? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

ক্ষণপরে খাইয়ের এক দিক হইতে পাঞ্জাবী গীতের গুঞ্জন উঠিল। গান শুনিয়া সকলের প্রাণে আবার স্ফূর্তি দেখা দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারিদিক নিঝুম। বোধা সিং খালি তিনটি বিস্কুটের টিনের উপর নিজের দুই কম্বল পাতিয়া লহনা সিং-এর কম্বল ও ওভারকোট গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। লহনা সিং খাড়া পাহারা দিতেছে। এক চোখ খাইয়ের মুখে, এক চোখ বোধা সিং-এর জ্বরতপ্ত দেহের উপর। বোধা সিং উঃ-আঃ করিতেছিল।

—বোধা ভাই, কি রকম বোধ কচ্ছ ?

—একটু জল দাও লহনা।

লহনা সিং রোগীর মুখের কাছে ফ্লাস্ক লাগাইরা বলিল, "কোন কষ্ট হচ্ছে, বোধা সিং ?

এক ঢোক জল খাইয়া বোধা সিং বলিল, শীত যেন একেবারে হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। রোমে রোমে বিজলী চলছে।

—আচ্ছা আমার জারসীটা পরে নাও।

—তুমি কি করবে ?

—আমার পাশে তো উন্থনই রয়েছে। আমার এমনিতে গরম লাগছে। ঘাম ছুটছে যেন।

—না, না আমি পরব না! চারদিন থেকে তুমি শীতে জমে যাচ্ছ, দিনরাত আমার পিছনে লেগে আছ।

—ভাল কথা মনে পড়েছে! আজ সকালেই এক নূতন জারসী এসেছে যে! বিলাত থেকে মেমসাযেবরা বুনে বুনে পাঠায়। গুরু ওঁদের মঙ্গল করুন।

বলিয়া লহনা সিং কোট খুলিয়া ভিতর হইতে নিজের জারসী বাহির করিল ও বোধা সিংকে পরাইয়া দিয়া সেই নিষ্ঠুর শীতে শুধুমাত্র জিনের কোট ও খাকী শার্ট পরিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। খাইয়ের মুখ হইতে শব্দ আসিল, সুবেদার হাজরা সিং ?

—কে, লপটন সায়েব ? কি হুকুম হুজুর ? ফৌজী সেলাম করিয়া সুবেদার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

—দেখো, এখুনি আক্রমণ করতে হবে। একমাইল দূরে পূর্ব্বদিকের ঐ কোণে জার্ম্মানদের এক খাই আছে। ওতে পঞ্চাশের বেশী লোক

নেই। ঐ সব গাছের পাশ দিয়ে রাস্তা, তিন চার বার মোড ঘুরতে হয়। যেখানে পয়লা মোড় সেখানে আমি পনেরোজন লোক মোতায়েন করে এসেছি। দশজন এখানে রেখে বাকী সব নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। খাই ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, যতক্ষণ দ্বিতীয় হুকুম না পাবে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

—জো হুকুম।

নিঃশব্দে আক্রমণের উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। বোধা সিং কম্বল একপাশে সরাইয়া রাখিয়া যাইতে উদ্যত হইলে লহনা সিং তাহাকে নিবৃত্ত করিল। লহনা সিং যাইতে প্রস্তুত হইলে বোধার বাপ সুবেদার হাজরা সিং তাহাকে আঙ্গুলের ইশারা করিয়া নিষেধ করিলেন। সঙ্কেত বুঝিয়া লহনা সিং খাই পাহারায় থাকিয়া গেল। কে কে পাহারায থাকিবে, এই নিয়া কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলে। কেহ থাকিতে চায় না! সুবেদার সকলকে বুঝাইয়া শেষে লোক লইয়া আগাইয়া গেলেন। লহনা সিং-এর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, সাহেব উনুনে সিগারেট ধরাইয়া লহনাকে একটা সিগারেট দিয়া বলিল, "এই নাও, তুমিও খাও।"

বিস্মিত হইয়া লহনা সিং ভাল করিয়া সায়েবের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাও।" হাত বাড়াইতে কৌশলে চোখ ফিরাইয়া লহনা সিং সায়েবের মুখ দেখিতে পাইল। তাদের লপটনের লম্বা চুল ছিল, এব চুল কয়েদীর মত ছোট করিয়া ছাটা। ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সন্দেহ হইল, হয়ত চুল কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছে। পরীক্ষা করিবার জন্য লহনা সিং গল্প জুড়িয়া দিল। সে পাঁচ বৎসর হইতে সাহেবের রেজিমেণ্টে আছে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সাহেব, আমরা দেশে ফিরব কবে?"

—লড়াই শেষ হলেই। কেন, এ-দেশে ভাল লাগছে না নাকি?

—না সায়েব। শিকারের কোন সুযোগই নেই। তোমার মনে আছে, গেল বছর নকল লড়াইয়ের জন্য আমরা জগাধরী জেলায় গিয়েছিলুম? একদিন শিকারেও যাওয়া হয়েছিল। তুমি ছিলে খচ্চরের পিঠে। তোমার খানসামা আবদুল্লা রাস্তার পাশে এক শিবমন্দিরে পূজা দিতে গেল। তোমার গুলিতে ইয়াবড়া নীল গাই পড়ল। কী তার শিং। তুমি বলেছিলে শিং বাঁধিয়ে রেজিমেন্টের মেসে টাঙ্গাবে। কিন্তু শেষকালে শিং দু'টির হ'ল কি?

—আমি বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

—খুব বড় শিং ছিল, না? দু' দু'ফুট তো খুব হবে?

—দু'ফুট পাঁচ ইঞ্চি ছিল। তুমি সিগারেট খেলে না?

—এই খাই সাহেব। দেশালাই নিয়ে আসি।

বলিয়া লহনা সিং স্থানত্যাগ করিল। কর্ত্তব্য সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটি যে জার্ম্মান আর সন্দেহ নাই। আঁধারে কে একজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইতেই লহনা সিং বলিল, "কে? বজীরা সিং?"

—হ্যাঁ হ্যাঁ বজীরা সিং। একটু শুতে দেবে না নাকি? দুশমন কোথাকার। দুটো চোখের পাতা লেগে এসেছে, কি বিপর্য্যয় ধাক্কা। প্রলয় হচ্ছে না কি?

—একটু আস্তে কথা বল বজীরা। প্রলয়ই বটে! লপটন সাহেবের জামাকাপড় পরে এসেছে। আমাদের আসল সাহেব হয় মারা গেছে, না হয় ধরা পড়েছে, সুবেদার তো ওঁর মুখ দেখতে পাননি, হুকুম পেয়ে খাই খালি করে সব লোকজন নিয়ে ওপারে চলে গিয়েছেন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি, আর চেহারাও দেখেছি। বেটা কি পরিস্কার উর্দ্দ বলে। তবে বইয়ের উর্দ্দ। আর

জান, আমায় সিগারেট দিলে খেতে।

—তা হ'লে এখন উপায় ?

—বেঘোরে মারা যাবে সব দেখছি। সুবেদার জলকাদা ভেঙ্গে এক মাইল দূরে মরণের মুখে এগিয়ে গিয়েছেন। এদিকে খাইয়ের উপর হবে অক্রমণ। তাডাতাড়ি এক কাজ করো, পল্টনের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে তুমি তাডাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুবেদারকে ফিরিয়ে আন। এখনও বেশী দূরে যেতে পারেননি। ওকে সব বুঝিয়ে বলবে। এমন ভাবে যাবে যেন পাতার উপর পায়ের শব্দ না হয়।

—কিন্তু লপটন সাহেবেব হুকুম তো—

—লপটন সাহেবের বাবা লহনা সিং তোমায হুকুম দিচ্ছে। আমি এখন সকলের বড অফিসার। যাও, যা বলছি করো।

—কিন্তু ভাই, তোমরা এখন আটজন মাত্র রয়েছ। সামলাবে কি কবে ?

—আটজন নয়, দশ লাখ! শিখের নাম ডুবালে দেখছি। ছেলে-বেলা থেকে শোনানি—এক শিখ সওবা লাখের সমান ? যাও, যাও দেরী কবো না।

লহনা সিং ফিরিয়া খাইয়ের মুখে পৌঁছিযা থমকিয়া দাঁড়াইল। লপটন তখন জেব হইতে বেলের মত তিনটি বোমা বাহির করিয়া খাইয়ের গায়ে গুঁজিযা দিতেছে। এক তার দিয়া তিনটির মুখে বাঁধিল। তারের গোডার দিকে সূতার এক থলির মত ছিল। থলে উনুনেব পাশে রাখিয়া, সাহেব বাইরের দিকে গেল। সেখান হইতে দেশালাই জ্বালাইয়া থলির উপর রাখিতে যাইতেছে, এমন সময় লহনা সিং

বন্দুকের চোঙ দু'হাতে ধরিয়া বাঁট ফিরাইয়া লপটনকে আঘাত করিল। কাঁধে আঘাত লাগিয়া সায়েব পড়িয়া যাইতেই লহনা সিং এক লাফে পাশে আসিয়া তাহার পকেট খুঁজিতে লাগিল। গোটা-চারেক খাম ও এক ডায়েরী বাহির করিয়া নিজের পকেটে পুরিল। সাযেবের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে লহনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি গো লপটন, হুজুরের মিজাজ শরীফ? অনেক জিনিস আজ শেখালে সায়েব। শিখ সিগারেট খায়, জগাধরী জেলায় নীল গাই পাওয়া যায়, আর তার শিং হয় দু'ফুট পাঁচ ইঞ্চি। মুসলমান খানসামা শিবমূর্ত্তি পূজা করে, আর লপটন সায়েব খচ্চর চড়ে। কিন্তু এমন সাফ উর্দ্দু শিখলে কোথেকে? আমাদের সাযেব তো ড্যাম না বলে চারটি শব্দও মুখ থেকে বের করতে পারে না।

লহনা "লপটনে"র পাৎলুনের জেব খুঁজিয়া দেখে নাই। সাহেব যেন শীতের জন্য হাত দু'টি পাৎলুনের পকেটে ঢুকাইল।

লহনা সিং বকিয়া চলিয়াছে—"কি চালাকীই করলে। কিন্তু লহনা সিং যে পাঁচ বছর থেকে সায়েবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। তার চোখে ধুলো দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা! দেশ ছেড়ে আসবার তিন মাস আগে আমাদের গাঁয়ে এক মৌলবী এলেন। মেয়েদের ছেলে হবার ওষুধ, ছেলেদের রোগ সারবার ওষুধ দিয়ে বেড়ান, চৌধুরীদের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে লোক জমা করে বক্তৃতা দেন। আমি মৌলবীর দাড়ী—"

সাহেবের জেব হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। লহনার জঙ্ঘায় গুলি লাগিল। এদিকে লহনার বন্দুকের গুলিতে সায়েবের মাথার খুলি উড়িয়া গেল। লহনা পাগড়ী ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে কসিয়া পট্টি বাঁধিয়া রক্ত বন্ধ করিল। ইতিমধ্যে সত্তরজন জার্ম্মান চীৎকার

করিয়া খাইযের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। আট জন শিখ একজোট হইয়া বাধা দিল। কিন্তু কতক্ষণ? জার্ম্মানরা ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে।

সহসা পিছন হইতে ধ্বনি উঠিল, "ওয়াহ গুরুজী দী ফতেহ। ওয়াহ গুরুজী দা খালসা। তৎ শ্রী অকাল।"

বজীরা সিংহ সুবেদারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়াছে। সঙ্গে আরো অনেক শিখ সৈন্য। লড়াই শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। জার্ম্মানরা নিঃশেষে প্রাণ দিল। শিখেদের পনেরো জন প্রাণ হারাইল। লহনা সিং-এর পাঁজরাতে (rib)-ও গুলি লাগিয়াছিল। ঘায়ে খাইযের মাটি পুরিয়া পাগড়ীর কাপড় দিয়া শক্ত করিয়া পটি বাঁধিয়া লহনা কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষতের রক্ত বন্ধ হইল না। কেহ জানিতে পারিল না যে, লহনা সিং গুরুতর আহত হইয়াছে।

লড়াইয়ের সময় চন্দ্র মেঘমুক্ত হইয়া আকাশে হাসিতেছিল। কিন্তু হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। একেবারে বাণভট্টের—দন্তবীণো-পদেশাচার্য্য—অর্থাৎ দাঁতের ঠক্‌ঠক্ বীণাবাদন শিক্ষাদাতা। বজীরা সিং বলিতেছিল—"আমি ফ্রান্সের মণখানেক মাটি দুই জুতায় ভরিয়া সুবেদারের কাছে পৌঁছিলাম। সুবেদার সব শুনে তোমার উপস্থিত বুদ্ধির খুব তারিফ করতে লাগলেন।"

এই লড়ায়ের শব্দ তিন চার মাইলের মধ্যে যে যেখানে ছিল শুনিতে পাইয়াছিল। টেলিফোনে ফীল্ড হাসপাতালে খবর পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। দেড় ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার, ষ্ট্রেচার, ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজ পৌঁছিয়া গেল। সাধারণভাবে প্রাথমিক শুশ্রূষা শেষ হইলে আহত-দিগকে হাসপাতালে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সুবেদার

লহনা সিং-এর ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধাইতে চাহিলে লহনা সিং হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বোধা সিং জ্বরে কাতরাইতেছিল। তাকে গাড়ীতে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। লহনাকে ছাড়িয়া সুবেদার যাইতে চাহিতে-ছিলেন না, কিন্তু লহনা সিং কঠিন কঠিন শপথ করিতে লাগিল—"বোধা সিং-এর দিব্যি, সুবেদারণীর দিব্যি, যদি তুমি না যাও।"

—কিন্তু লহনা সিং, তোমারও তো যাওয়া দরকার।

—তোমরা পৌঁছে গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো। তাছাড়া জার্ম্মান যারা মরেছে, তাদের সরাবার জন্যও তো গাড়ী ফের আসবে? আমার ঘা সামান্য। দেখছ না, দিব্যি দাঁড়িয়ে আছি। বজীরা সিং আমার কাছেই রইল।

—আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই মানছি, কিন্তু—

—আর কিন্তু-টিন্তু নয় সুবেদারজী। বোধা সিংকে ভাল করে শুইয়ে দিয়েছ তো? আর শোন, সুবেদারণী হীরাকে যে চিঠি লিখবে তাতে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবে যে, ওঁর কথা আমি রেখেছি। কিছু ভুলিনি।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুখ বাড়াইয়া সুবেদার বলিলেন, "লিখব মানে? এক সঙ্গে দেশে যাব। সুবেদারণীকে যা বলবার তুমিই বলো! তুমি আমার আর বোধার প্রাণ বাঁচিয়েছ লহনা সিং। জনম ভোর তোমার ঋণ ভুলব না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন। যা আমি বলেছি, তাই করো! সুবেদারণীকে জানিয়ো তার কথা আমি ভুলিনি। সাধ্যমত রাখবার চেষ্টা করেছি। লিখতে ভুলো না। দেশে গিয়ে মুখেও বলো।

গাড়ী দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই লহনা ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। "বজীরা সিং, জল দে ভাই। আর আমার পটি খুলে দে। রক্তে

একেবারে ভিজে গিয়েছে।”

মৃত্যুর ছায়ায় যখন জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্ব-স্মৃতি উজ্জ্বল হয়। কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বহুদিন-বিস্মৃত বস্তু ব্যক্তি পুনরায় স্মরণপথে জাগিয়া উঠে। লহনা সিং স্বপ্নজাগরণের ঘোরে বাল্যে ফিরিয়া গিয়াছে—এক এক করিয়া পূর্ব্ব জীবনের ঘটনা মোহচ্ছন্ন দৃষ্টির পটে ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া যাইতেছে।

—বারো বৎসরের এক বালক। অমৃতসরে মামার কাছে আসিয়াছে। দইওলার দোকানে, সব্জী বাজারে যেখানে সেখানে এক বালিকাকে দেখিতে পায়। আট বৎসর বয়স তার। দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে—“তোর কুড়মাই হয়ে গিয়েছে? জবাব পায়—ধেৎ। একদিন জবাব পাইল—“হঁ্যা হয়ে গিয়েছে, দেখছিসনে রেশমী ফুলদার এই ওড়না?” শুনিতেই লহনা সিং বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।.........

—বজীরা সিং জল দে ভাই।

জীবনের পঁচিশ বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে। বাল্যস্মৃতি মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সাত দিনের ছুটি লইয়া জমাদার লহনা সিংহ গ্রামে ফিরিয়াছিল। তিনদিন পরেই চিঠি আসিল—শীঘ্র চলে এসো। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার হাজরা সিং-এর পত্রও আসিল। “বোধা সিংকে নিয়ে আমিও ফিরছি। তুমি ফিরতি পথে আমাদের বাড়ী হয়ে এলে ভাল হয়! একসঙ্গে পৌঁছে যাব।”

লহনা সিং সুবেদারেব বাড়ী পৌঁছিল। যখন সকলে রওনা হইবে, তখন সুবেদার বলিলেন—“লহনা, সুবেদারণী তোমায় চেনেন।

ডাকছেন ওঘরে। একবার ভেতরে হ'যে এসো।"

সুবেদারণী আমায় জানেন? কোথায় দেখা হয়েছিল? কবে? ভাবিতে ভাবিতে লহনা ভিতরে পৌঁছিল। নমস্কার করিল। ভিতর হইতে আশীর্ব্বাদ হইল।

—আমাকে মনে পড়ে?

—না তো!

—তোর কুড়্‌মাই হয়ে গিয়েছে?—ধেৎ।

—হ্যাঁ কাল হয়ে গিয়েছে। দেখছ না ফুলদার ওড়না?

—মনে পড়ে না অমৃতসরের কথা?

ভাবের আঘাতে বিকারের ঘোর কাটে। রক্তচক্ষু মেলিয়া লহনা সিং ফের জল চায়—"বজীরা সিং পানি পিলা দে।" আবার চোখ মুদিয়া আসে। স্বপ্নের সূত্রে জোড়া লাগে—আমি তোমায় দেখেই চিনেছিলাম। এক মিনতি আছে। আমার তো কপাল মন্দ।

বোধা সিং-এর পর চার ছেলে হয়েছিল—পোড়াকপালীর ভাগ্যে সইল না, এখন এই এক বেটা। সেও যাচ্ছে লড়াইয়ে।

সুবেদারণীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্য অশ্রুমুখী বেদনাবিকল মাতৃমুখচ্ছবি স্মৃতিপটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া আবার—"এখন দু'জনেই চলে যাচ্ছে। আমি একলা ঘরে কি নিয়ে দিন কাটাব। কপালে আর কি আছে কে জানে। তোমার মনে পড়ে কি, একদিন টাঙ্গার নীচে থেকে আমায় বাঁচিয়েছিলে, তোমার নিজের হাত পা জখম করে? আমার প্রাণ একদিন বাঁচিয়েছিলে লহনা সিং। এখন সেই এক প্রাণ দু' দেহ ধরে বিদেশে বিভূঁয়ে যাচ্ছে—আবার তোমার হাতে সঁপে দিলুম। দুঃখিনী আঁচল বিছিয়ে ভিক্ষে চাইছে, লহনা সিং। বল, এদের রক্ষা করবে?

কাঁদিতে কাঁদিতে সুবেদারণী ভিতরে চলিয়া গেলেন। চোখ মুছিয়া লহনা সিং ফিরিল।......

লহনা সিং-এর মাথা কোলে রাখিয়া বজীরা সিং বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে মুখে জল দিতেছে। আধ ঘণ্টা নীরব থাকিয়া লহনা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কে, কীরত সিং?

বজীরা কি বুঝিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

কীরত সিং লহনার ভাই।

"কীরত সিং, আমার মাথাটা আর একটু উঁচুতে রাখ। সেই আম গাছে এবার আম ধরবে খুব। খুড়ো ভাইপো মিলে খুব আম খাবি। যত বড় আম, তত বড় ভাইপো। দু'টির একই বয়স। যে মাসে ওর জন্ম সেই মাসেই গাছ লাগিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে খবর বাহির হইল, ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে জমাদার লহনা সিং বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শতরঞ্জ খেলোয়াড়

ওয়াজিদ আলী শাহের রাজত্বকাল। লক্ষ্ণৌ বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ মগ্ন। ছোট বড় ভেদ নাই, আমীর গরীবের কথা নাই, প্রত্যেকটি লোক নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ অনুসারে নানা অনাবশ্যক নেশায় চুর হইয়া দিন কাটায়। নাচ-গানে কেহ মত্ত, কেহ আফিমের নেশায় বুঁদ। মোরগের লড়াই, বটেরের লড়াই, বাজ পাখীর শিকার; আর আছে ঘুড়ি উড়াইবার ধুম! যে জিনিষ আজকাল মাত্র ছোট ছোট ছেলেদের

মনোরঞ্জন করে, একটু বয়স বাড়িলেই যাহা কিশোর বয়স্কদের কাছে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, সেই ঘুড়ির লড়াইয়ে যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধের কি প্রচণ্ড উৎসাহ। যেখানে সেখানে এক একটি মেলার মত লোক—কি নাকি, ঘুড়ি-যুদ্ধ হইতেছে। চীৎকারে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম। মাঝে মাঝে কবি-মজলিস বসে। অতি তুচ্ছ ধরনের কবিতাকণা লইয়া চেঁচামেচির অন্ত নাই। বাহবা, ক্যা খুব, তুমনে তো গজব কর দিয়া, ইত্যাকার ধ্বনিতে কানে তালা লাগে। তাও আবার সব কবিতা অশ্লীল, অধিকাংশই ধর্ম্মবিরোধী এবং ন্যক্কারজনক। রাজ্যশাসন, সাহিত্য, ব্যবসা, সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুরই উপর বিলাসিতার ছায়া পড়িয়াছে। বিলাসিতার ছায়া তো নয়, আসন্ন সন্ধ্যা দিনান্তের ছায়া। মুসলমান রাজশক্তি নিঃশেষে নিভিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার যেন বিলাসিতার প্রলয় শিখায় শেষ মুহূর্তে শ্মশানোৎসব লাগাইয়া দিয়াছে। রাজকর্ম্মচারী শাসনবিমুখ, ঘুষখোর; কবিগণ অশ্লীলতা ও অধর্ম্মকেই বিষয়বস্তু করিয়াছেন; বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ঝালর, জরী ও চিকনের কাজ, নানা রূপের ও নানা রঙের ফুলতোলা প্রভৃতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নিয়াই আছে। সুরমা, আতর, নানা ধরণের গন্ধদ্রব্য, মিসী, কাজল বিবিধ প্রকার মশলা "তাকতকী দবা",—এই সবের বাজার সর্ব্বদা সরগরম। প্রতি বাড়ীতে বটের, তীতর প্রভৃতি পাখী লড়াইয়ের জন্য পালিত হইতেছে। আর আছে নিরন্তর তাস, পাশা, দাবা, শতরঞ্জ। বাজীর পর বাজী, অবিরাম বাজী চলিতেছে।

এই ব্যসনোন্মত্ত নগরে, যেখানে সকলেই ইহ-পরকাল ভুলিয়া আমোদ-প্রমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, সেখানেও মির্জ্জা সজ্জাদ আলী ও মীর রৌশন আলীর তুলনা মেলা ভার। তবে ভিক্ষুক যেখানে ভিক্ষালব্ধ অর্থে অন্নের পরিবর্তে মাদক দ্রব্য, গঞ্জিকা, আফিম

ইত্যাদি সংগ্রহ করে, সেখানে পুরুষানুক্রমে জায়গীর ভোগকারীদের স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া প্রমোদ-অন্ত-প্রাণ হওয়া আশ্চর্য্য কি! দুই বন্ধু সকালে উঠিয়া নাকে-মুখে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ গুঁজিয়া লইয়া দাবার ছক লইয়া বসেন। দাবাবোড়ে সাজাইয়া লইয়া, হয় হস্তী গজবাজী রাজা উজীরের সান্নিধ্যে শতরঞ্জ-লোকে একবার প্রবেশ করিলেই মন রঙীন লঘু পাখায় অবিরাম উড়িয়া চলে। শ্রান্তি ক্লান্তি নাই, সময়ের খেয়াল নাই। প্রভাত হইতে দুপুর; দুপুর গড়াইয়া বিকাল; তারপরে দিনের আলো নিভাইয়া দিয়া আসে রাত্রি। ইঁহারা সমস্ত চৈতন্যকে এক কেন্দ্রীভূত করিয়া তেমনি নিবিষ্ট, ধ্যানস্তব্ধ। মাঝখানে একবার যখন দুপুরের আহার আসে, অন্যমনস্কভাবে খাবারগুলি উদরস্থ হয়, খেলা এদিকে সমানে চলিতে থাকে। এক হাতে ঘুঁটি চালান, অন্য হাতে খাবার। মির্জ্জা সজ্জাদ আলীর বৈঠকখানাতেই শতরঞ্জের ছক পাতা হইত। সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না বটে কিন্তু চাকর-বাকর পর্য্যন্ত একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মির্জ্জার বেগম সুযোগ পাইলেই গায়ের ঝাল ঝাড়িতেন, কিন্তু সুযোগ পাইলে তবে তো! বেগম সকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সেই যে মির্জ্জা গিয়া বৈঠকখানায় দাখিল হইতেন, আর তিনি রাত্রে শয্যাশ্রয় করার পর পুনরায় শয়ন গৃহে উদিত হইতেন। বেগম আর কোন পথ না পাইয়া চাকরদের উপর রাগ ঝাড়িতেন। যদি কেহ মির্জ্জা সাহেবের নাম করিয়া আসিয়া পান, জল, দুপুরের আহার লইয়া যাইতে চাহিত তখন বেগম চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেন। কিন্তু অন্তঃপুর দূরে, গভীর পর্দ্দার অন্তরালে; বৈঠকখানায় তাঁহার তর্জ্জন-গর্জ্জন পৌঁছিত না। বেগমের ক্রোধটা মীর সাহেবের উপরই বেশী। তিনি ভাবিতেন স্বামীকে সাদাসিদা ভালমানুষ পাইয়া মীর সাহেব না হক উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার কারণও

ছিল। কালে-ভদ্রে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই মির্জ্জা সব দোষ মীরের উপর চাপাইতেন। মীরই তাহাকে বিগড়াইতেছে—এই ধারণা তাই বেগমের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

একদিন বেগমের মাথা ধরিল। তিনি তাড়াতাড়ি দাসীকে স্বামীর কাছে পাঠাইয়া খবর দিলেন—অবিলম্বে একবার আসিতে হইবে। হকীমের কাছে লোক পাঠানো চাই।

কিস্তী সামলাইতে ব্যস্ত মির্জ্জা কথা কানে না তুলিয়া জবাব দিলেন, "বলগে এখুনি যাচ্ছি।" বলিয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। বেগম পুনরায় দাসীকে পাঠাইয়া জানাইলেন—এই মুহূর্ত্তে না আসিলে, তিনি স্বয়ং হকীমের কাছে চলিয়া যাইবেন!

মির্জ্জা তখন বাজী জিতিবার মুখে। ঝালাইয়া বলিলেন—"একেবারে শেষ দশা উপস্থিত নাকি? দু'মিনিটের সবুর সয় না?"

মীর—শুনেই এসো হে। মেয়েদের মেজাজ একটু নরম-গরম হয়েই থাকে।

মির্জ্জা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো বলবেই। দুকিস্তিতে তুমি মাত হয়ে যাচ্ছ কি না।

—সেই ভরসায় থেকো না জনাব; এমন চাল ভেবে রেখেছি যে, তোমার দাবা-বোড়ে যেমন আছে, তেমনি থেকেও একেবারে চিৎপাত হয়ে যাবে। সে কথা যাক্। একবার গিয়ে দেখে এসো ব্যাপারখানা। খামোখা কেন বেচারীকে দুঃখ দাও।

—তোমার অতি আশ্চর্য্য চালটি দেখেই যাই।

—আমি খেলব না বলে দিলাম। তুমি একবার হয়ে এসো আগে।

—ভায়া, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, যেতে হবে হকীমের বাড়ী। মাথা-ধরা-টরা সব মিথ্যে। খামোখা আমাকে নাজেহাল করার ইচ্ছে।

—যাই হোক্, একবার দেখেই এসো।

—আচ্ছা, এই চালের পর।

—কিছুতেই না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবার বাড়ীর ভিতর না হয়ে এসেছ, আমি বোড়েতে আর হাত দিচ্ছি না।

মির্জ্জা আর কি করেন, যাইতেই হইল। বেগম কাতরাইতে কাতরাইতে খেদ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ঐ ছাই পাশ খেলা তোমার এমন পেয়ারের চীজ। এদিকে আমি মাথা ব্যাথায় মরে যাচ্ছি, এক লহমা উঠে আসতে চাও না। চুলোয় যাক এমন খেলা।"

মির্জ্জা—কি করি বল, মীর সাহেব যে মানতেই চান না। কত হাঙ্গামা করে তবে আসতে পেলাম।

—পোড়ার মুখ হতভাগা উচ্ছন্ন যাক। নিজে যেমন নিষ্কর্ম্মা অপদার্থ সকলকেই তেমনি মনে করে না কি? ওরও তো নিজের ছেলে-পিলে, ঘর-সংসার আছে—না সব খেয়ে বেরিয়েছে?

—বড় নাছোড়বান্দা লোক। একবার এসে পৌঁছে যাবার অপেক্ষা। তারপর খেলিয়েই ছাড়বে।

—তাড়িয়ে দাও না কেন?

—কি করে তাড়াই, তুমিই বল। সমান বয়স, সমান মান-মর্য্যাদা বরং একটু উঁচুই বলতে হয়। চক্ষুলজ্জাও তো আছে।

—তাহলে আমিই তাড়াব। রাগ করে, করবে। তার খাই-ও না পরি-ও না। রেগে যান তো যাবেন, ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন। —এই হিরিয়া, বাইরে থেকে শতরঞ্জ তুলে নিয়ে আয়। আর অমনি মীর সাহেবকে বলে দিবি আজ আর খেলা হবে না। মেহেরবাণী করে নিজের পথ দেখুন।

—কর কি, কর কি বেগম? ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ তো আছে

—দাঁড়া হিরিয়া, যাস কোথায় ?

—ওকে মানা করছ কেন ? আমার মাথা খাও, আমার রক্তে স্নান কর, যদি তুমি ওকে যেতে না দাও। আচ্ছা বেশ। ওকে তো মানা করলে। আমাকে আটকাও দেখি।

বলিয়া ক্রোধভরে বেগম পর্দ্দা অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে সোজা বৈঠকখানার দিকে সবেগে অগ্রসর হইলেন।

ত্রস্ত মির্জ্জা সাহেব পিছনে পিছনে মিনতি করিতে করিতে আসিতেছেন আল্লার দিব্য, হজরত হুসেনের দিব্য, আমার মরামুখ দেখবে, যদি ওদিকে পা দিয়েছ। বেগম কর্ণপাত না করিয়া ততক্ষণে বৈঠকের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজন্ম সংস্কার ও অভ্যাস ছিন্ন করিয়া সহসা পরপুরুষের সম্মুখীন হইতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। ক্রোধের সময়ও সংস্কার সজাগ। বেগম দরজার পাশে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর এক ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। ঘর খালি। মীর দু-এক ঘুঁটি এদিক-ওদিক করিয়া নিজের সততার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বাহির বারান্দায় পদাচরণ করিতেছিলেন। বেগম রণক্ষেত্র শত্রুশূন্য দেখিয়া বেগে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দাবা-যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এদিকে-ওদিকে ছড়াইয়া দিলেন, হুকখানা টান মারিয়া এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপরে বাহিরে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। মীর ভিতর হইতে একাধিক ঘুঁটি নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলেন, চুড়ির ক্রোধ-ব্যঞ্জক শব্দ শুনিলেন, শেষে যখন সশব্দে দরজা বন্ধ হইল, ব্যাপার অনুমান করিয়া যথাসম্ভব সত্বর নিজের বাড়ীর পথ ধরিলেন।

বিজয়োৎফুল্ল বেগমকে মির্জ্জা সখেদে কহিলেন, "তুমি একেবারে সর্ব্বনাশ করেই ছাড়লে।"

বেগম—এখনই হয়েছে কি। মীর আর এ মুখো হলে, সোজা গর্দ্দান ধরে বার করে দেব। কমবখ্‌ত নিখট্টু কঁহী কা।······হকীম সাহেবের ওখানে যাবে কি যাবে না ?

মির্জ্জা ঘর হইতে বাহির হইলেন তো হকীমের ঘরের দিকে পিছন করিয়া মীর সাহেবের বাড়ী পৌঁছিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মীর সাহেব বলিলেন, "ঘুঁটি উড়ে আসতে দেখেই আমি ব্যাপার আন্দাজ করেছিলাম। বেগম তোমার বড্ড বদ্‌রাগী ভায়া। তুমি নাই দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় চড়িয়ে রেখেছ, তুমি বাইরে কি কর না কর সে খবরে ওর কাজ কি ? ঘরের বউ, বউয়ের মতই থাক না।"

মির্জ্জা—যেতে দাও ওসব কথা। এখন বল, কাল থেকে কোথায় বসবে ?

মীর—জায়গার কি অভাব হে। এতবড় ঘর পড়ে আছে কি করতে !

—কিন্তু বেগমের গোসা ঠাণ্ডা করি কি উপায়ে। নিজের বাড়ী বসেই খেলতাম, তাতেই তার রাগ দেখো না। এখন তোমার বাড়ীতে খেলতে শুরু করলে আমায় আর আস্ত রাখবে না।

—কি যে বল তুমি। মেয়েদের রাগ জলের দাগ। দু'চার বার হাত পা ছুঁড়বে, চেঁচাবে, হট্টগোল করবে, তারপরে আপনা-আপনি সব ঠাণ্ডা। তবে তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে এখন থেকে। স্ত্রীর সামনে অমন মেনিমুখো হলে কি চলে ?

মীর সাহেবের বেগম সাহেবা কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিরন্তর স্বামীর অনুপস্থিতিই কামনা করিতেন। সেইজন্যই তিনি কখনও মীরের শতরঞ্জ প্রেমের উপর রুষ্ট হন নাই, বরং যেদিন মীর ঘর হইতে বাহির হইতে কোন আকস্মিক কারণে সামান্য বিলম্ব করিতেন, সেদিন বেগম

অস্থির হইয়া উঠিতেন ; বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেন সময় বহিয়া যাইতেছে। মীর এজন্য খুশি মনে ভাবিতেন তাঁহার স্ত্রী অতিশয় পতিব্রতা, স্বামীর সুখকেই সুখ জ্ঞান করেন। এখন যখন মীরের বৈঠকখানায় শতরঞ্জের আসর বসিতে লাগিল, তখন বেগমের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার অবাধ স্বাধীনতায় বাধা পড়িল।

চাকরদেরও অসুবিধার সীমা নাই। এতদিন কোন হাঙ্গাম হুজ্জত ছিল না। শুইয়া বসিয়া দিন কাটাইয়াছে। দু'একটি দৃষ্টিকটু ব্যাপার হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেই দিনভোর আরাম। যাহার যেমন খুশি চলুক না, তাহাদের কি। শুধু তাহাদের আয়েশীতে বাধা না দিলেই হইল। সেই সুখের দিন আর বুঝি থাকে না। পান নিয়ে আয়, মিঠাই কিনে আন, এলাচিদানা হাজির কর—এসব তো আছেই। তার উপর আছে অনির্ব্বাণ গুড়গুড়ি। রাবণের চিতার মত, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অগ্নির মত তাহা আর নিভিতে পায় না। দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে হাতে পায়ে ব্যথা, কোমরে বাত ধরিবার যোগাড়। দাসদাসীরা আসিয়া সমদুঃখিনী হুজুর বেগম সাহেবার বরাবর সমস্বরে নালিশ পেশ করিল। বেগম আশ্বাস দিলেন উপায় হইবে।

রাজ্যে হাহাকার উঠিয়াছে! দিনদুপুরে ডাকাতি, খুন, রাহাজানি। নিরীহ প্রজার ধন-প্রাণ বলবানের খেলার বস্তুতে পরিণত। সর্ব্বত্র ঘোরতর বিশৃঙ্খলা। প্রতিকার করিতে পারে বা ইচ্ছা রাখে, এমন কেহ নাই। গ্রামের ধন-দৌলত সহরে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয়, সেখান হইতে তাহা বারবনিতার ঘরে, তাহাদের দালালের ঘরে গিয়া উঠে। ইংরেজ কোম্পানীর নিকট ঋণ দিন দিন বাড়িতেছে, ভিজা কম্বলে অনবরত জল জমিয়া তাহা ভীষণ ভারী হইয়া উঠিতেছে। রাজকোষও শূন্য—ইংরেজের বার্ষিক প্রাপ্যই আদায় হয় না। রেসিডেণ্ট বরাবর নবাবকে

সাবধান করিতেছেন কিন্তু নবাব কানে তুলা গুঁজিয়া আছেন।

বাহিরে এইভাবে ধ্বংসের শেষ দিন দ্রুত পদক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে ; কিন্তু চক্ষু-কর্ণহীন দুই জায়গীরদার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শতরঞ্জ ক্রীড়ায় আপন-পর বিস্মৃত হইয়াই আছেন। নিত্য নূতন ধরনের বাজী ; নিত্য অপর পক্ষকে বৈঠকী-রণে পরাজয়ের প্রয়াস ; নূতন ব্যুহরচনা ; নব পরিকল্পনায় সৈন্যসামন্ত সমাবেশ। কখন কখন ঝগড়া, চেঁচামেচি, অপভাষা প্রয়োগ। ক্ষণ পরে মিত্রতা ও পুনরায় নূতন উদ্যমে খেলা শুরু হয়। মাঝে মাঝে রাগারাগির মাত্রা একটু বেশী চড়িয়া যাইত। খেলা ফেলিয়া মির্জ্জা ঘরে চলিয়া যাইতেন। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার উভয়ে একই প্রেরণাবশে একই কালে বৈঠকখানায় উপস্থিত। দোয়া-সালাম বিনিময় এবং তৎক্ষণাৎ খেলা আরম্ভ। গতকল্যের বচসার উল্লেখমাত্র কেহ করে না।

দুই বন্ধু শতরঞ্জের পাঁকে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময় এক-দিন নিশাশেষের দুঃস্বপ্নের মত এক বাদসাহী ঘোড়সওয়ার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মীর সাহেবের সন্ধান করিতেছে। মীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। চাকরকে বলিলেন, "বলে দে ঘরে নেই।"

ঘোড়সওয়ার—ঘরে নেই তো কোথায় ?

চাকর—জানিনে। কি দরকার ?

—দরকারে তোর কি দরকার ? নবাব সাহেব তলব করেছেন আর কি ! বোধ হয় ফৌজের জন্য সেপাই চাই। জায়গীরদার হলেই হল অমনি। দল নিয়ে লড়ায়ে যেতে হলেই কত ধানে কত চাল বোঝা যাবে। কুড়ের বাদশার মত দিনরাত বসে বসে অমনি নবাবের নিমক খাচ্ছেন।

—আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এখন যাও; এলে বলে দেব।

—তোমার বলে কাজ নেই। আমি কালই ফের আসব। সাথে করে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

ঘোড়সওয়ার চলিয়া গেল। মীর শ্বাসরুদ্ধ করিয়া এতক্ষণ উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, জমা সব হাওয়া এক সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়া হতাশ-কণ্ঠে দোস্তকে শুধাইলেন, "এখন উপায়?"

মির্জ্জা নিজের কথাই আগে ভাবিতেছিলেন। চিন্তিতমুখে বলিলেন —"ভারি মুশকিল হল দেখছি। আমাকেও না ডেকে পাঠায়।"

—ব্যাটা ফের কাল আসবে বলে গেল যে।

—যত সব আপদ কি আমাদেরই কপালে। কোথাও যদি লড়াইয়ে যেতে হয়, তবেই গেছি আর কি!

—আমি বলি, ঘর থেকে উধাও হওয়া যাক। কাল থেকে চল গোমতীর কিনারে কোন নিরালা জায়গায় আসর জমাই। ওখানে কে খুঁজতে আসবে। সেই যে নবাব আসফোদ্দলার তৈরী ভাঙ্গা মসজিদ আছে!

—উওল্লাহ, ক্যা খুব, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় দোস্ত।

এদিকে মীর সাহেবের বেগম হাসিয়া লুটোপুটি। ঘোড়সওয়ারকে ঐ কথাই বলিতেছিলেন; বলিহারি তোমার বুদ্ধির। সওয়ার আত্ম-প্রসাদে টইটুম্বুর হইয়া, সব দন্ত বিকশিত করিয়া জবাব দিল— এদের কি আর হুঁস আছে। শতরঞ্জ ওদের মাথার ঘি চেটে মেরে দিয়েছে। কাল থেকে আর ঘরে থাকতে হবে না। আমাদের রাস্তা ফের পরিষ্কার।

পরদিন সকালে দুই বন্ধু অন্ধকার থাকিতেই গৃহ হইতে অন্তর্হিত

হইলেন। বগলে একখানা বসবার জন্য ছোট শতরঞ্চ, হাতে পানের ডিবে, এক পুঁটুলিতে খেলার সরঞ্জাম। ত্বরিৎপদে গোমতী পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন জনসমাগমশূন্য ভাঙ্গা মসজিদে আশ্রয় লইলেন। নোনাধরা দেওয়াল, মাঝে মাঝে ইট খসিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে মেজেতে গর্ত্ত। ভিতরে দিনের বেলায়ও চামচিকা উড়িতেছিল। একটু জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া উভয়ে ছক পাতিলেন। রাস্তায় তামাক-ছিলিম হুঁকা টিকা সংগৃহীত হইয়াছিল। হুঁকা ভরিয়া লইয়া তামাক সাজিয়া শতরঞ্জ পাতিয়া সেই যে খেলায় নিমগ্ন হইলেন, ক্ষুধার তাড়না অনুভব না করা পর্য্যন্ত আর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন না। ক্ষুধার জ্বালা তীব্র হইয়া উঠিলে কিছু দূরে এক রুটিওয়ালার দোকানে গিয়া ইঞ্জিনে কয়লা দিয়া আসিলেন। তামাক সাজিয়া লইয়া আবার খেলায় বসিলেন। এইভাবে নিত্য চলিতে লাগিল। কোন কোন দিন খাবার কথা পর্য্যন্ত মনে থাকে না।

এদিকে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কোম্পানীর ফৌজ ক্রমে লক্ষ্ণৌর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সহরে বিষম অব্যবস্থা। অধিকাংশ লোক ছেলেমেয়ে, স্ত্রী লইয়া দূর গ্রামে পালাইতেছে। কিন্তু মির্জ্জা মীরের কোন খেয়ালই নাই। একের পর এক কিস্তি মাৎ হইতেছে। প্রাতঃকালে যখন মসজিদে আসিতেন, রাত্রে যখন ঘরে ফিরিতেন, বড় রাস্তা দিয়া যাইতে সাহসে কুলাইত না—পাছে নবাবের লোক দেখিতে পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়।

নিত্যকার মত সেই ভাঙ্গা মসজিদে উভয়ে খেলায় মগ্ন আছেন, এমন সময় একদিন দূরে ইংরেজ কোম্পানীর ফৌজ আসিতে দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ দখল করিবার জন্য গোরা সৈন্য আসিতেছে।

সেদিন মির্জ্জার বাজি কিছু দুর্ব্বল ছিল। তিনি তদ্গতচিত্তে

আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। মীরের দৃষ্টিই প্রথমে গোরাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখ, ইংরেজের ফৌজ আসছে। আজ কি জানি কি হয়।"

মির্জ্জা—তুমিও যেমন। ইংরেজ আসছে তো আসছে। এদিকে তোমার উজির যে মলো। বাঁচবে তো এগোও।

মীর—একটু দেখা দরকার। এসো এই দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে ব্যাপার কি দেখি।

—জল্‌দি কিসের, দেখে নিয়ো পরে। এই কিস্তি তো আগে সামলাও।

—সঙ্গে তোপও আছে দেখছি। পাঁচ হাজার লোক তো খুব হবে। দেখতে বেঁটে বেঁটে বটে, কিন্তু সাবাস জোয়ান। বাঁদরের মত লাল মুখ। দেখে ভয় হয়। কেন খামকা বকছ হে; টালবাহানা করে আমার চাল থেকে রেহাই পাবার ফন্দী খুঁজছ বুঝি। সামলাও কিস্তি।

—তুমি বড় আজব লোক ভায়া। সহরের উপর এই বিপদ, আর তোমার কিস্তির নেশাই ছুটছে না। ভেবে দেখছ কি, চারদিক থেকে সহর যদি ঘিরে ফেলে তো ঘরে পৌঁছবে কি করে?

—ঘরে যায়ার সময় হলে ভাবব'খন। এসে তোমার উজির তো সামলাও। আর সামলাতে হয় না; এক কিস্তিতেই একেবারে মাৎ!

সৈন্যদল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। আবার ছক পাতা হইল। খেলা চলিল বেলা দশটা অবধি। মীর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তো সব ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকবে। খাবে কোথায়?"

—তোমার তো একটা না একটা উৎপাত লেগেই আছে। খাবে কোথায়? কেন, আজ রোজা রাখা যায় না? বেলা তো মোটে দশটা,

এরই মধ্যে পেটে আগুন লেগে গেল নাকি ?

মীর অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "না, না, তা কেন। সহরে না জানি আজ কি হচ্ছে। বাড়ীতে সব একলা।"

মির্জ্জা বলিলেন, "হবে আবার কি। লোক খাচ্ছে-দাচ্ছে, মৌজ করছে। হুজুর নবাব সাহেবও প্রমোদকুঞ্জেই আছেন নিশ্চয়ই।"

আবার খেলা চলিতে লাগিল। খেলিতে খেলিতে তিনটা বাজিয়া গেল। এইবারও মির্জ্জার বাজি টলমল করিতেছিল। তাহার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই গোরা সৈন্য ফিরিয়া আসিতেছে দেখা গেল। নবাব ওয়াজিদ আলীকে বন্দী করিয়া ইংরেজরা কোন এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া চলিয়াছে। সহরে কোন বিক্ষোভ নাই, দাঙ্গাহাঙ্গামা নাই, একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই। ইতিহাসে লেখে না আজ পর্য্যন্ত কোন স্বাধীন দেশের রাজার রাজ্যচ্যুতি এমন বিনা রক্তপাতে হইয়াছে। কিন্তু এ তো শান্তি নয়, এ মুনিজনকাম্য অহিংসা নয়, এ ঘোর কাপুরুষতা,—বহুদিনব্যাপী বিলাস-সম্ভোগের পরিণামে দেহ-মনে যে ঐকান্তিক দৈন্য-দশা উপস্থিত হয়, এ তাহাই। বিশাল অযোধ্যার অধীশ্বর সাধারণ চোর-ডাকাতের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আপন রাজধানীর মধ্য দিয়া নীত হইতেছেন। প্রজাপুঞ্জ আরামের, ব্যসনের নেশায় বুঁদ হইয়া ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়াও দেখিতেছে না।

মীর বিমনা হইয়া কহিলেন—হুজুর নবাব সাহেবকে লালমুখো বাঁদরেরা ধরে নিয়ে গেল।

মির্জ্জা বলিলেন—হবে। সামলাও কিস্তি।

মীর—তোমার কি আর কিছুতেই হুঁস হবে না। আমার আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। বেচারা নবাব। যে অশ্রু এখন তার চোখ দিয়ে ঝরছে, সে তো আঁখিজল নয়, হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু

হয়ে বেরিয়ে আসছে।

মির্জ্জা—তা আর বলতে। এমন আয়েস-আরাম আর কি কোথাও নসীব হবে?

—এমন হৃদয়হীনের মত কথা বলো না ভায়া, কারও দিন এক ভাবে যায় না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। নাও, এবার কিস্তি সামলাও। বানচাল হল বলে।

—খুদা কি কসম, তুমি বড় হৃদয়হীন। এমন সর্ব্বনাশ চোখের সামনে দেখেও মনে একটু দুঃখ নেই। হায়, বেচারা ওয়াজিদ আলী শাহ্!

—আগে নিজের বাদশাকে তো বাঁচাও ভায়া· ওয়াজিদ আলী শা'র ভাবনা পরেই না হয় ভেবো। এই কিস্তিতেই মাৎ, তা বলে রাখছি। ফেলো বাজি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ভাঙ্গা মসজিদে চামচিকা দলের কল-কোলাহল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাবুইপাখীরা আসিয়া নিজেদের নীড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু খেলোয়াড় দু'জনের বিশ্রাম নাই। মির্জ্জা ক্রমান্বয়ে তিনবাজি হারিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এবারকার বাজিও তেমন সুবিধার নয়। কিন্তু ক্রোধ ও হৃদয়াবেগকে প্রাণপণে সংহত করিয়া মুখ চোখকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া মির্জ্জা খেলিয়া যাইতেছেন। এবার জেতা চাই-ই। এদিকে মীরের যেন জয়ের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পূর্ব্বের বিমনা ভাব আর নাই। স্ফূর্ত্তির চোটে কখন কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন, কখন তুড়ি দিতে দিতে কোন গজলের দু'এক চরণ গাহিতেছেন। মির্জ্জা রাগে ফুলিতেছেন। বাজী যতই হারিবার মুখে যাইতেছে, ততই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। এখন কথায়

কথায় ঝগড়া বাধিবার উপক্রম। বলিতেছেন, "এ কি রকম চাল তোমার মীর সাহেব! ঘুঁটি হাতে নিয়ে বসে আছ তো আছই। এতক্ষণ নেবে কেন? যতক্ষণ চাল স্থির না করছ, ঘুঁটিতে হাত দিতে পাবে না। তা না, কখন এদিক ফেরাচ্ছ কখন ওদিক ফেরাচ্ছ। এক চালে রাত কাবার। ও-রকম চলবে না বলে দিচ্ছি। এক চাল চালতে পাঁচ মিনিটের বেশী নাও তো বুঝব হেরে গেলে।······ফের তুমি চাল বদলালে? যেখানে বসিয়েছিলে, সেখানেই রাখ বলছি।"

মীরের হার হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বলিলেন, "আমি চাল দিলাম কবে যে, বদলাবার কথা উঠছে?"

—চাল তুমি চেলেছ। বোড়ে যেখানে রাখছিলে, ওখানে ছেড়ে দাও। ঠিক ওই ঘরেই রাখা চাই।

—আমি তো বোড়ে হাত থেকে নামাইনি।

—ওই হাত ওদিকে নিয়ে গেলেই হল। ঘুঁটি আঁকড়ে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বসে থাকবে নাকি? একবার ওদিকে তো একবার ওদিকে। যেই দেখলেন হেরে যাচ্ছেন, অমনি চাল বদলে দিলেন। সে হবে না। কুস্তীর মারপ্যাঁচ নাকি? যত সব চালাকি।

—হারজিত ভাগ্যের খেলা। চালাকী করছি আমি না তুমি?

—তাহলে মেনে নাও তুমি এই বাজী হেরেছ?

—বললেই হোল? আমি হারলাম কবে?

—তবে ঘুঁটি ঐ ঘরেই রেখে দাও। হার কি জিত, এখনই মালুম হয়ে যাবে।

—ওখানে কেন রাখব? কিছুতেই রাখব না।

—রাখতেই হবে। রাখবেন না আবার। চৌদ্দপুরুষ কি তোমার কেউ শতরঞ্জ খেলেছে যে, খেলার মর্ম্ম জানবে! বাপ দাদা তো ছিল

ঘাসিয়ারা। এখন হয়েছেন মীর সাহেব। জায়গীর পেলেই যদি স্বভাব বদলে যেত, তবে কথা ছিল কি ?

—ঘাসিয়ারা ছিল তোর বাপ, বলিয়া মীর ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মির্জ্জাও উঠিয়া পড়িয়া আরক্তমুখে বলিলেন, যত বড় মুখ না তত বড় কথা। নবাব বাড়ীতে বাবুর্চিখানায় মা ঠাকুমা কাজ করে পেট চালিয়েছে, এখন তুমি আমীর হয়েছ। ছোট লোকের মুখে আগুন।

মীর গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সাবধান মির্জ্জা, প্রাণের মায়া থাকে তো চুপ করো।"

মির্জ্জা—ঘাসিযারার ছেলের আবার সাহস আছে নাকি। সাহস থাকে তো বের কর তলোযার। তৎক্ষণাৎ উভয়ে কোমরে ঝুলানো খাপ হইতে তলোয়ার বাহির করিলেন।

নবাবী আমলে প্রায সকলেই অস্ত্র রাখিত—বিশেষ, আমীর ওমরাহগণ। প্রচলিত প্রথানুসারে মীরজা মীর, দুজনেই দেহ সজ্জার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে তরবারি ঝুলাইয়া চলিতেন। কিন্তু তাহা খাপ হইতে বাহির করিবার আর অবকাশ ঘটে না, বজ্রনিঃশেষিত বিদ্যুতের মত কৃপাণ কোষ মধ্যে নিদ্রাগতই থাকে। বাল্যে উভয়ে একই ওস্তাদের নিকট অসিচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু অব্যবহারে লব্ধবিদ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া উৎসমুখে যে জড়ত্বের জঞ্জাল জমিয়াছে, আচম্বিতে অতি প্রবল ধাক্কা লাগিয়া তাহা নিমেষে সরিয়া গেল; ধমনীতে পুনরায় উষ্ণ শোনিত স্রোত খর বেগে বহিতে লাগিল। ভোগবিলাস আরাম আয়েশীর বিপুল ভস্মস্তূপে আচ্ছাদিত হইয়াও তাতার-রক্তের তেজবীর্য্য নিঃশেষে নিভিয়া যায় নাই। যাহারা নবাব সৈন্যে যোগ দিবার ভয়ে, যুদ্ধে যাইবার সম্ভাবনামাত্রে, আঁধারে আঁধারে

পেচকের মত মুখ লুকাইয়া বেড়াইতেছিল, মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিতেই তাহারা আহত সিংহের মত রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তলোয়ার চলিতে লাগিল; সান্ধ্য সমীরণে তরঙ্গ তুলিয়া সঘনীড়াশ্রয়ী পক্ষীদিগকে সচকিত করিয়া অস্ত্রের ঝনঝনা বাজিতে লাগিল—প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্ষিপ্রগতিতে। আঘাত সামলাইয়া, প্রতিঘাত করিয়া দুই বন্ধু লড়িতে লড়িতে মসজিদের বাহিরে উন্মুক্তস্থানে আসিয়া পৌছিলেন। দূরদিগন্তে তরুশ্রেণীর অন্তরালে সন্ধ্যার রক্তরশ্মি সুন্দরীর সীমন্তে সিন্দুর রেখার মত তখনও জ্বলজ্বল করিতেছিল। মাথার উপরে, একটি দুটি করিয়া কৌতূহলী তারকা পাতলা অন্ধকারের যবনিকা সামান্য সরাইয়া অন্তরাল হইতে উঁকি দিতেছে, আবার তখনই সভয়ে মুখ লুকাইতেছে। সেই অর্দ্ধ স্বচ্ছ প্রদোষান্ধকারে উন্মুক্ত অম্বর তলে পরস্পর শোনিতপিপাসু দুই সুহৃৎ ঘাত-প্রতিঘাত করিতে করিতে কখন একই সঙ্গে সাংঘাতিক আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন; প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে বিলম্ব হইল না। যুদ্ধ ইহারা ভুলিয়া যায় নাই, উদ্দীপ্ত হইলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে জানে,—হৃদয়ের শোনিতে সেই প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বিলাস-ব্যসনের যুগান্ত সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবাল্য সহচর দুই অভিজাত বংশীয় যুবক অযোধ্যার নবাবী আমলের সঙ্গে সহমৃত হইল। শত উত্থান-পতনের সহস্র-চক্ষু মূক সাক্ষী সূর্য্যদেব পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িলেন। নবাবের ভাগ্যরবি, মীর্জ্জা-মীরের জীবনরবি সেই সঙ্গে চিরতরে অস্তমিত হইল।

রামলীলা

এক যুগ হইয়া গিয়াছে, ইদানীং আর রামলীলা দেখিতে যাই না। সে বয়স নাই, সে চোখ নাই। বীভৎস মুখোস, কালো রঙের খাটো কোর্ত্তা, হাঁটু অবধি লম্বা পায়জামা—এই পরিয়া ছ' ছ' ফিট লম্বা জোয়ান মর্দ্দ সব লাফাইতেছে, ঝাঁপাইতেছে, হুস-হাস, উপ-আপ করিতেছে। দেখিয়া এখন হাসি পায়, অভিভূত হই না। কাশীর রামলীলা দেশ-বিখ্যাত। দূর দূরান্ত হইতে কত লোক ভিড় করিয়া আসে। অনেকদিন হইল একবার কৌতূহলবশে আমিও গিয়া জুটিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চোখে কাশীর রামলীলা ও আমাদের অজ পাড়াগাঁর রামলীলায় তেমন কোন ইতর-বিশেষ ধরা পড়িল না। রামনগরে সাজ-পোশাক একটু জমকালো সন্দেহ নাই। রাক্ষস ও বানরের মুখোস সব পিতলের তৈরী; বনগমনোদ্যত ভ্রাতৃযুগলের মাথার মুকুটও বেশ দামী ও ভাল কাজ করা মনে হইল। এই মাত্রই। বাকী সব সেই হুস-হাস, লাফ-ঝাপ, তীর ধনুক লইয়া নকল লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ। হাতে গোঁফ † ঢাকিয়া একজন স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করিয়াও গেল।

তবু শত শত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভিড়। তেল-নুন-লকড়ীর চাপে, গৃহিনীর প্রতাপে, সাম্প্রতিক সাহিত্যের উত্তাপে যাহাদের অন্তরের অন্তঃশীলা রসধারা নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই, কল্পনাশক্তি একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, তাহারা এখনও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অভিনেতারা তাহাদের কাছে উদ্দীপক উপলক্ষ্য মাত্র। আসরে পা

---

† কাহারও কাহারও কাছে গোঁফ এমন প্রিয় বস্তু যে অভিনয়ের প্রয়োজনেও দু'চারি দিনের জন্য তাহার বিরহ সয় না। যদি তাহাদিগকে স্ত্রীলোক সাজাইতেই হয়, তবে গোঁফসুদ্ধ চালাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রাখিতে না রাখিতে ইহারা সত্যযুগে, কল্পান্তপূর্ব্বের অযোধ্যা-দণ্ডক-লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান্ তাহাদের হৃদয়-রাজ্যে সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া সঞ্চরণ করিতে থাকেন। তাই তো, নৈশ গগন মথিত করিয়া শত সহস্র ভক্তিগদগদ আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ হইতে মুহুর্মুহুঃ বন্দনা ধ্বনি উঠে :—জয় সীয়াবর রামচন্দ্র কী জয়।

সীতারাম-জয়ধ্বনিতে সেদিনও যোগ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা যেন ক্ষণিকের আবেশ মাত্র। হায় রে, কোথায় গেল বাল্যের সেই পুলক-বিহ্বলতা, সেই তন্ময় আত্মবিস্মৃতি! একদিন আমিও কি সমগ্র মনপ্রাণ-চৈতন্য এককেন্দ্রীভূত করিয়া রামলীলা দেখি নাই, শুনি নাই, প্রাণের পরতে পরতে স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ-সঞ্চারের মত অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করি নাই! বাস্তবে কল্পনায় মিশামিশি—স্বপ্ন-জাগরণে একাকার সেই দিনগুলি কি আর একবার ফিরিয়া পাই না?

আমাদের বাড়ী হইতে রামলীলার মাঠ বেশী দূরে ছিল না। যে ঘরে অভিনেতাদের সাজানো রঙ্ পরানো হইত, তাহা তো আমাদের বাড়ীর একেবারে লাগাও ছিল। বেলা দুইটার সময় হইতেই রঙ করা আরম্ভ হইয়া যাইত। তার অনেক আগেই আমি নাকে-মুখে গুঁজিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেখানে পৌঁছিয়া হাজিরা দিতাম। তাহাদের টুকিটাকি ফরমাশ খাটিতে পাইলে আর কিছু চাহিতাম না। তাহারাও খুব খাটাইয়া লইত। আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই, অনবরত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিতেই লাগিয়া আছি। সে উৎসাহ-আনন্দ-উত্তেজনার কি তুলনা হয়! এখন তো টাকা ধর্ম্ম, টাকা স্বর্গ অবস্থা, কিন্তু পেন্সন আনিতে যাইতেও সেই বাল্য-উৎসাহের কণামাত্র আর অনুভব করি না।

কোণের এক ছোট কামরায় রাজকুমারদের 'শিঙ্গার' হইত। 'রামরজ' চূর্ণ করিয়া অঙ্গে লাগান হইত, মুখে পাউডার, তার উপর লাল

সবুজ নীল রঙের বিন্দু দেওয়া—কপাল, ভুরু, গাল চিত্র-বিচিত্র বিন্দুতে ভরিয়া যাইত। দলের মধ্যে একটি মাত্র লোক অঙ্গসজ্জায় নিপুণ ছিল। সে-ই ক্রমান্বয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে সাজাইত। রঙের পেয়ালায় জল লইয়া আসা, রামরজ চূর্ণ করা, পাখার বাতাস করা—এই সব ছিল আমার কাজ। সাজসজ্জার পর যখন রামচন্দ্রের রথ বাহির হইত, তখন তাহাদের পিছনে এক আসন অধিকার করিয়া আমার সে কি উল্লাস! ভিক্ষুক যেন অকস্মাৎ রাজ্যখণ্ড পাইয়া গিয়াছে। আজ লাট সাহেবের দরবারে খানা-পিনায় নিমন্ত্রিত হই; ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া চলিবার কালে অন্তরে গর্ব্বোৎফুল্ল ভাবের আমেজও যে অনুভব করি না তাহা নহে, কিন্তু বাল্যের সেই দিব্য অনুভূতির আস্বাদ আর পাই না। জীবনপথে চলিতে চলিতে দুঃখ বিপদের ফাঁকে ফাঁকে কত রকমের সাফল্য, সৌভাগ্য সুদিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি—বিবাহ, পুত্র-পৌত্রের মুখ দর্শন, নিজের ও সন্তানদের বড় চাকুরী প্রাপ্তি, দেশী ও সরকারী নানা রকম খেতাব ও সম্মান, কিন্তু আর একবারও কি ক্ষণেকের তরেও বাল্য-কৈশোরের সেই আনন্দ-সমাহিত শান্তরসাস্পদ অপরোক্ষানুভূতির দর্শন পাইতে নাই! সে দিন নাই, সে বয়স নাই, সে চোখ নাই, সর্ব্বোপরি যাহা নয়কে হয়, হয়কে নয় করে, সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াবিনী কল্পনা নাই।

বুঝিতে পারিতেছি, প্রাণপণে কতকগুলি বিশেষণ একত্র করিয়া সেই আনন্দ-সমাধির আভাস দেওয়ার চেষ্টা কি নিষ্ফল বিড়ম্বনা। তাহার চেয়ে সেই কাহিনী শোনাই, কি করিয়া স্বপ্নভঙ্গ হইল। বয়ঃসন্ধিকালে—যখন সব কিছু বয়সের ধর্ম্মেই ভারী হইয়া আসিয়া মনকে নিম্নগামী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এক রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন টুটিয়া গেল। প্রতিমার পিছনের খড় বাহির হইয়া পড়িল। সেও এক অশ্রুজলাভিষিক্ত

করুণ কাহিনী, কিন্তু তাহা পূর্ব্বাস্বাদিত দিব্যানুভূতি নহে। বড় পার্থিব ধরনের আঁখিজল, পার্থিব কারণেই ঝরিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আবার ক্রোধ ও লজ্জাবোধ মিলিয়া আছে। এই বয়সের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই এতকাল পরেও সব খুঁটিনাটি স্মরণে পড়ে।

রামলীলা সেই বছরের মত শেষ হইয়া গিয়াছিল ; শুধু রামের সিংহাসনারোহণ বাকী। অন্যবার তাহা তাড়াতাড়ি হইয়া যায়। এইবার বিলম্ব হইতেছিল। আমি তো অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। নিত্য খোঁজখবর লইতাম। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, খোঁজখবর আমিই শুধু লই, আর কেহ দুইদিন আগের শত সহস্র লোকের নয়ন-পুত্তলি রামচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই পোষণ করে না। রোজ যাই আর দেখি আমার রামচন্দ্রের মুখ ম্লান। বেচারাকে বাড়ী যাইতেও দেয় না, অথচ এদিকে অনাদর অবহেলার অবধি নাই। চৌধুরীর ওখান হইতে সিধা আসিতে আসিতে রোজ বেলা তিনটা বাজিয়া যায়। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ তখন রান্না করিতে বসেন। সকাল হইতেই কিছু পেটে পড়ে নাই। তাঁহাদের করুণ ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইত। সাজ-পোশাক, রঙ না থাকিলে কি হইবে। আমার চোখে যে তাঁহারা তখনও অযোধ্যার রাজকুমার, রাজকুলবধূ। মাসাধিক কালের একাগ্র চিন্তার মোড় কিশোর মনে এত সহজে কি ঘুরিয়া যাইতে পারে ?

মা আমাকে সকালে যা কিছু খাইতে দিতেন, আমি তাহার অর্দ্ধেক রাম-লক্ষ্মণদের জন্য লইয়া যাইতাম। মা কোনদিন নিষেধ করেন নাই, বরং খাবার বরাদ্দ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তবে বাবাকে জানাইয়া নহে ; সে আর এক কাহিনী।

দুঃখীর দিনও কাটে। অবশেষে রামচন্দ্রের ক্লেশ অবসানের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আবার রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে অপরূপ প্রাণমনোহারী সাজে সাজানো হইল। আজ সন্ধ্যায় রাজা রাম রাজ্যারোহণ করিবেন। রামলীলার মাঠে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। লোকের ভিড়ও খুব। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রতি গৃহের পত্রপুষ্পসজ্জিত দ্বারে শোভাযাত্রা থামাইয়া রামচন্দ্রের আরতি হইতে লাগিল! সকলে সাধ্যমত ভেট দিল। আমার পিতা ছিলেন পুলিসের দারোগা। ইহলোকে যেমন সব জিনিস বিনামূল্যে পান, কলা-মূলা হইতে কাপড়-চোপড় বাসনপত্র কোন কিছুর জন্য নগদ নারায়ণ বাহির করিতে হয় না, পরলোকেও সেই রকম সস্তায় সওদা করিবার পূর্ণ ভরসা রাখিতেন। প্রথা মত আমাদের বাড়ীর দ্বারেও আরতি হইল, কিন্তু দারোগাজী কিছু দিলেন না। আমার দুঃখ-নিরাশার যেন অবধি নাই। এত দুঃখ সহিয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আনন্দামৃত-বর্ষক রাজাধিরাজ রামচন্দ্র ঘরে ফিরিতেছেন, তাহাকে কিনা আমাদের দরজা হইতে এক রকম ফিরাইয়া দিলে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দশহরার সময় মামা আমাদের ওখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। যাইবার সময় আমাকে একটি টাকা দিয়াছিলেন। আমি উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ছুটিয়া গেলাম, নেকড়ায় বাঁধা টাকাটি টিনের বাক্স হইতে বাহির করিয়া, আরতির থালায় রাখিয়া দিলাম। পুত্রের দানশীলতা ও পিতার কার্পণ্য দেখিয়া সকলের মুখে চকিতে অদৃশ্য রকমের হাসির আভাস খেলিয়া গেল। বাবা আমার দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিপাত করিলেন! কিন্তু আমি তখন যেন হাওয়ায় উড়িয়া চলিয়াছি। "দারোগাই" দৃষ্টির তেমন কোন প্রভাব অনুভব করিবার মত অবস্থা নহে। কাবু হওয়া তো দূরের কথা।

রাত্রি দশটায় পরিক্রমা শেষ হইল। আরতির থালি টাকা পয়সায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলে অনুমান করিল পাঁচশ টাকার কম হইবে না। কিন্তু চৌধুরীর মুখ ভার। তিনি কিছু বেশীই খরচ করিয়া ফেলিযাছিলেন। শ' দুই টাকা গচ্চা যাইবে দেখিয়া তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে এক উপায় বাহির করিলেন।

রাজ্যাভিষেকের রাত্রে প্রতি বৎসর "মেয়েদের" দ্বারা নাচগান করানো হইত! রাজসভায নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যে নৃপতির সন্তোষ বিধান করিবে—ইহা তো অভিষেকের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুঁথি-পত্রেই লেখা আছে। তবে এই সব ছলাকলার কারবারীরা যে নেহাৎ দেবকন্যা নয়, সেই বোধ ক্রমে জাগ্রত হইতেছিল! এবার হঠাৎ আমার জ্ঞাননেত্র খুব ভাল করিয়াই খুলিয়া গেল।

কি কারণে মনে পড়ে না, আমি এক কোণে আঁধারে দাঁড়াইয়া-ছিলাম। আর একটু দূরে আলোতে চৌধুরী দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে যেন কথা বলিতেছিলেন। আমি দু' পা আগাইয়া গিযা দেখিলাম, অযোধ্যার রাজসভার সেই নটী। আমার বয়স কম বলিয়া তাহারা আমাকে গ্রাহ্যই করিল না নিজেদের সলাপরামর্শ তেমনি করিয়া যাইতে লাগিল। চৌধুরী বলিতেছেন, "দেখ আবাদীজান, এ তোমার ভারী অন্যায়। এ কি আমাদের নূতন জানাশোনা যে, এত দর কষাকষির দরকার পড়েছে। এতকাল ধরে প্রতি বৎসর আসছ যাচ্ছ; ভবিষ্যতেও তোমার পুরোপুরি আশা রয়েছে। দেখছ তো এ বছর টাকাকড়ি আর বছরের চেয়ে কম এসেছে। নইলে কি আমি সামান্য টাকার জন্য কিপ্টেমো করেছি কোনদিন ?"

আবাদীজান নাক-মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল, "আমি তোমার খাস তালুকেও বসত করিনে যে তোমায় ভয় করব; তোমার ঘরের বউ নই

যে বুক ফাটবে তো মুখ ফুটবে না। জমিদারী চাল-চালাকি তোমার খাতক-প্রজা, চাকর-বাকরের জন্য তুলে রাখ। আমার চোখে ধুলো দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয় চৌধুরী সাহেব। টাকা আদায় করব আমি, আর গোঁফে তা দিয়ে পকেটে পুরবে তুমি। ভ্যালা টাকা রোজগারের ফন্দী ঠাউরেছ যা হোক! দাও না বাইজীদের একটা চাকলা বসিয়ে। দু'দিনে লাল মোহরী লাল হয়ে যাবে।"

চৌধুরী কাতর হইয়া কহিলেন, "আবাদীজান, এই কি ঠাট্টা-তামাসার সময়। এদিকে আমার বলে ধড়ে প্রাণ নেই। দু দু'শো টাকা যদি আমার ঘর থেকে যায়, তবে আমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখ।"

আবাদী তেমনি অবিচলিতভাবে জবাব দিল, "আমার সঙ্গে চালাকি না করলেই পার। তোমার মত এমন অনেক চৌধুরীকে রোজ আমি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাই—বলিয়া চৌধুরীর নাকের ডগা হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত আঙ্গুলের সাহায্যে এক দড়ির আকার আঁকিয়া দিল।

চৌধুরী হতাশ ভাবে বলিলেন, "তুমি কি চাও খুলেই বল।"

আবাদী—"তবে শোন। আমি যা উশুল করব, তার অর্দ্ধেক আমার।"

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া চৌধুরী শেষকালে বলিলেন—"আচ্ছা, আমি রাজী।"

—"তা হলে আগে আমার ফুরনের একশো টাকা দাও।"

চৌধুরী বিস্ময়ে ছোট চোখ দু'টি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাছের খাবে, তলারও কুড়োবে? আদায়ী টাকার অর্দ্ধেক যদি নাও, তবে আবার ঐ একশো কেন?"

আবাদীজান বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তো টাকা আদায় করবার কোন কথা নয়। ফি বছর আসি, নাচি গাই চলে

যাই, এবারও তাই করে যাব। কারো পকেটে হাত চালাতে যাব কেন? তা যদি করাতে চাও, অর্দ্ধেক বখরা।"

কি করেন, মুখ ভার করিয়া চৌধুরী অগত্যা রাজী হইলেন।

নাচ শুরু হইল! আবাদীজানের চেহারা বেশ ভালই ছিল! বয়সও কম। যার সামনেই একবার বসিল, তাহারই পকেটের ভার কিছু না কিছু লাঘব করিয়া তবে উঠিল। এক রকমের নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। পাঁচ টাকার কম কেহ আর বাহির করিতে পারে না। আবাদীজান এর ওর কাছে টাকা আদায় করিয়া শেষকালে আমার পিতৃদেবতার সামনে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তাঁহার হাত ধরিয়া গানের কলি বার বার গাহিয়া চলিল। আমার কি জানি কেন মুখ লজ্জায় একেবারে রাঙা হইয়া আসিতেছে। সব লোক বাবাকে ভয় করিয়া চলে। চেহারাও খুব রাশভারী। যাহারা দেখা করিতে আসে সকলেরই কাঁচুমাচু মুখ, সশঙ্ক দৃষ্টি। বাবা কথা বলেন তো ধমক দিয়া। আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই, কেহ তাঁহার হাত ধরিতে পারে। তাও আবার শত শত লোকের সাক্ষাতে। বাবার কিন্তু সেই স্বাভাবিক রাগত ভাব কোথায় উবিয়া গিয়াছে। তিনি হাত ছাড়াইয়া লইলেন বটে, কিন্তু অপ্রসন্নভাবে নহে। কে একজন পিছন হইতে বলিল, "এখানে তোমার কারসাজি চলবে না আবাদীজান, বৃথাই হয়রান হচ্ছ। কিন্তু আবাদী এবার দু'হাতে বাবার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি প্রাণ-পণে কামনা করিতেছিলাম, বাবা যেন মেয়েটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। কিন্তু ঠেলিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। বরং তিনি এমন ভাব ধরিলেন—যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছেন। চোখ-মুখ হইতে তৃপ্তি উছলিয়া পড়িতেছিল। পিছন হইতে যে তাঁহার কার্পণ্যসূচক টিপ্পনি কাটিয়াছিল, তাহার দিকে এক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পকেট

হইতে এক মোহর বাহির করিলেন। দেখিয়া আমার যে কি হইল বলিতে পারি না। আমি সভা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিলাম। একবার ভাবিলাম—মায়ের কাছে গিয়া সব বলিয়া দিই। কিন্তু তাহা আর করিলাম না। মা যে আমার সুখী নহেন, তাহা সেব বয়সেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বৃথা তাঁহার দুঃখ বাড়াইয়া কি লাভ।

পরদিন প্রাতে রামচন্দ্র বিদায় হইবেন। আমি ভোরে শয্যা ত্যাগ করিযাই চোখ কচলাইতে কচলাইতে উহাদের ঘরে গিয়া হাজির। ভয় ছিল, পাছে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা হইবার আগেই উঁহারা চলিযা যান। গিয়া দেখি, আবাদীজানের যাত্রার জন্য গাড়ী আসিয়াছে। জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা হইতেছে। এত ভোরেই বিশ পঁচিশ জন ভক্ত রসিক সেখানে জুটিযা গিযাছে। আমি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিযাই সোজা রাম-লক্ষ্মণের ঘরে পৌঁছিলাম। সীতা ও লক্ষ্মণ নিজেদের চারপাইয়ের উপর বসিযা কাঁদিতেছেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সন্ত্বনা দিতেছেন। রামও বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত। কাঁধ হইতে দড়িতে বাঁধা এক লোটা পিঠের উপর ঝুলিতেছিল। বগলে গামছায় বাঁধা মলিন এক পুটুলী। আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ নাই। আমি কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের 'বিদায়' হয়ে গেছে ?"

—হ্যাঁ হয়ে গেছে। আমাদের আর বিদায় কি ভাই। চৌধুরী সাহেব বললেন, "চলে যাও," তাই যাচ্ছি।

—টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় পেয়ে গেছ ?

—আর ভাই টাকাকড়ি। কিছুই তো দিলেন না চৌধুরী সাহেব, বললেন এবার কিছু বাঁচেনি। পরে একদিন এসে নিয়ে যেয়ো।

—একেবারে কিচ্ছু পাওনি ?

—এক পয়সাও না। বলেন কিছু বাঁচেনি! আমি ভেবেছিলাম—কিছু পেলে পড়বার বই কিনব। গত বছর অন্যদের বই নিয়ে নিয়ে পড়েছি। পরীক্ষার সময় কেউ দেয় না। তখন ভারি অসুবিধে হয়।

কথা বলিতে বলিতে রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "পথের খরচও কিছু দিলে না ভাই। বলে, কতই বা দূর, হেঁটে চলে যাও।"

আমার মনে এমন ক্রোধ হইল যে, সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাইজীর জন্য শত শত টাকা, গাড়ী-ঘোড়ার বন্দোবস্ত! আর এদের জন্য দু'চার আনাও কেহ ব্যবস্থা করে নাই। কাল রাত্রে যাহারা বেশ্যার দৃষ্টিতে মোহিত হইয়া পাঁচ পাঁচ দশ দশ টাকা ভেট চড়াইয়াছিল, তাহারা দু'দুটি পয়সা এদের দিতে পারে না? বাবাও তো কাল এক মোহর দিয়াছেন। দেখি এবার এদের জন্য কি দেন। বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

কিন্তু আমি গিয়া মুখ খুলিবার অবসর পাইলাম না। আমাকে দেখিয়াই বাবা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ঘুম থেকে উঠেই কোথায় গিয়েছিলেন বাবু সাহেব? পড়াশোনার নাম নেই, সকাল থেকেই উধাও! কোথায় ছিলি?"

আমি দম লইবার অবকাশ পাইতেই বলিয়া ফেলিলাম, "রাম-লক্ষ্মণকে বিদায় করতে গিয়েছিলাম। চৌধুরী ওদের কিছু দেন নাই বাবা।"

—তাতে তোর কি? ভক্ত হনুমান সেজেছেন। খেয়ে দেয়ে কম্ম নেই, পাজী কোথাকার।

আমি মরিয়া হইয়া বলিলাম, ওরা যাবে কি করে? রাস্তা খরচও কিছু পায়নি।

বাবা যেন একটু নরম হইলেন। বলিলেন—এ চৌধুরীর ভারী অন্যায়। কিছু দেননি ?

আমি সাহস পাইয়া বলিলাম, "না বাবা, এক পয়সাও না। ওরা কাঁদছিল। আপনি যদি দুটো টাকা—"

বাক্য আর শেষ করিতে হইল না। বাবা এমন বিকট হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন যে, আমি তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করাই সুবুদ্ধি বিবেচনা করিলাম।

পিতার উপর ক্রোধ ছিল, কিন্তু ভয় ছিল তারও বেশী। কথায় কথায় তিনি চড়-চাপড় চালাইতেন। আমি আর কি করি ; উদ্দীপ্ত ক্রোধ শান্ত করিয়া মায়ের নিকট হইতে দুই আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়া ওঁদের দিয়া আসিলাম। দুই আনা মাত্র পয়সা, কিন্তু তাঁহাদের আনন্দ ধরে না। তিনজন ঐ দুই আনা সম্বল করিয়াই বাড়ী চলিলেন। যতক্ষণ না তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন, ততক্ষণ আমি সেই শূন্য কক্ষের দ্বারে মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিলাম।

সেইবারের রামলীলার প্রভাব আমার সমগ্র জীবনে বিস্তৃত হইয়াছিল। আমাদের পিতাপুত্রের প্রকাশ্য তিক্ততা সেই যে শুরু হইল, তাহা আর থামে নাই। আমি আর কোনদিন পিতাকে মান্য করি নাই, কোন কথা শুনি নাই। দারুণ প্রহার করিয়াও তিনি আমার জেদ ভাঙ্গাইতে পারেন নাই। শেষকালে আমাদের বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কুমুরে পোকা

গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে দূরের জিনিস নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার কত বর্ষব্যাপী সাধনার ফল, কত বিনিদ্র রজনীর ভাবনাসঞ্জাত, কে বলিতে পারে! দূরবীক্ষণটির জন্য বৈজ্ঞানিকের চিত্তে এই ব্যাকুলতা কেন জাগিয়াছিল?

প্রশ্নটা তামাসার মত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক আবিষ্ক্রিয়ার পশ্চাতে আবশ্যকতাবোধ তো সিদ্ধ হওযা চাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, দূরকে নিকটে করিবার বাসনা জগতে বিদ্যমান ছিল। বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় তাহা আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহার ফলে হইল এক নূতন বস্তুর সৃষ্টি।

মন যেন প্রশ্নের খনি। মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন 'কেন'র সেখানে উদয় হয়। সুতরাং এক কথায় কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে না। এর পরেও 'কেন' আছে। মানুষের মনে দূরস্থকে নিকটস্থ করিবার বাসনা কেন উপস্থিত হইল? আশেপাশে যে সব জিনিস রহিয়াছে, তাহা তো এখনও ভাল করিয়া দেখা হয় নাই! হাতের কাছে, সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ায় সৃষ্টি-বিনাশের যে অভিনয় রাত্রিদিন চলিতেছে, তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া চন্দ্রলোকের ধ্যানে বিভোর হইবার আগ্রহ কেন?

ভাবিতে ভাবিতে, আমারই ঘরের মধ্যে এই একমাস ধরিয়া যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতেছিল, বায়স্কোপের ছবির মত তাহার একের পর এক দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া চলিল।

আর কিছু নয়, এক কুমুরে পোকার কথা। স্মরণাতীত কাল হইতে মা, দিদিমারা বলিয়া আসিতেছেন, কুমুরের বাসা ভাঙ্গিতে নাই। ভাঙ্গিলে চোখে আঞ্জুনি হয়। আহারান্তে বিছানায় শুইয়া এক ফরাসী গ্রাম্য গাথা-

সংগ্রহ পড়িতেছিলাম। এমন সময় এক কুমুরে খসখসের পর্দ্দা ডিঙাইয়া কামরায় প্রবেশ করিল—ভর্‌র্‌র্‌…বোঁ…ভর্‌র্‌র্‌…বোঁ। বই ছাড়িয়া আমার চোখ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। গুপ্তধনের অন্বেষণে সন্ধানী যেমন নির্ণীত স্থানের প্রত্যেক অংশ শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে, ও-ও তেমনি ঘরের প্রাত্যক কোণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া চলিল। প্রায় আধ ঘণ্টায় তাহার পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। এক জায়গা পছন্দ হইয়াছে। ঠিক ঝরোকার নীচেই। আরো কিছুকাল এদিক ওদিক সতর্কতার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। এত সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম। যা হোক, সেদিনের মত তো শেষ। পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শয্যাশ্রয় করিতেই দেখি জানলার নীচে সেই মনোনীত স্থানে মাটির এক গোল ঘর তৈয়ারী হইতেছে। মসজিদের গম্বুজের মত ঘর, মাঝখানে এক ছোট্ট দরজা।

বাল্যে পিতৃভবনে, যৌবনে পতিগৃহে গৃহ নির্ম্মাণ অনেক দেখিয়াছি। ইট-পাথরের, চুণ-বালির স্তূপ, মিস্ত্রীদের আনাগোনা—এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এই পতঙ্গ যে বাসা তৈয়ার করিতে লাগিল, ফরাসী পল্লী-গীতিকার মদির রসপ্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া মন আমার তাহাতেই পড়িয়া রহিল। ছোট হোক, বড় হোক, একখানা ঘর তৈরী করিতে কতলোক লাগে?…রোগশীর্ণা বালিকা মাকে বলিতেছে "মা আমার রেশমী পোশাক এনে দাও। আমি আমার নিঠুর প্রেমিকের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।"

"বলিস কি বাছা? সাতদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছিস তুই। ডাক্তার উঠতে মানা করেছে যে! এতদূর কি করে যাবি মা?"

আশ্বাস দিয়া মেয়ে বলিতেছে, "তুমি ভেবো না মা-মণি; দেখা না করে আমি যে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। ওসব ডাক্তারের ওষুধে আমার

অসুখ সারবে না। যেতেই হবে আমায়। আমার রেশমী জামা আর টুপী এনে দাও না—সেই রঙীন কিনারাওয়ালা টুপীটা।

……কি নিষ্ঠুর পুরুষ! মরণাপন্না বিরহিনীকে একবার কি চোখের দেখা দেখিতেও আসিল না! কিন্তু প্রেমে আত্মবিস্মৃতা তরুণীর তাহাতে কোন অভিমান নাই। নিজেই সে দেখা করিতে যাইবে। কি রসোদ্বেল এই পল্লীগাথা!…কিন্তু মন আবার সেই কুমুরের বাসায় ফিরিয়া আসিল। ছোট হোক, বড় হোক, সেই ঘর তৈরী করিতে কত লোক লাগে? কেউ নক্সা তৈরী করে, কেউ জিনিসপত্র আনে; মজুর মিস্ত্রী ঠিকাদার গাড়ী-ওয়ালাদের রীতিমত ভীড় লাগিয়া যায়। আর এই নগণ্য পতঙ্গ? একাধারে সব। একলাই সব ঝক্কি পোয়াইতেছে! মানুষ মনে করে সে বুদ্ধির ভাণ্ডার, কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণীর কত জ্ঞান। এত সব ও ভাবে কি করিয়া? এর মনেও কি মানুষের মত সংস্কার, স্মৃতি, ভাবনা আছে? রৌদ্র-বর্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া হয়ত মনে হইল একখানা ঘর চাই। ঘরের উপকরণ সম্বন্ধে ভাবিল, স্থান নির্ণয় করিল, শেষে কাজে লাগিয়া গেল।

আমি ভাবিতেছিলাম, ও কাজ করিতেছিল। এরই মধ্যে কতবার যে ভিতর-বাহির হইল তার ইয়ত্তা নাই। বাহিরে গিয়া কোথা হইতে এতটুকু কাদা মুখে করিয়া ফিরে। ঘরের উপরে বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে। যেখানে একটু নীচু, সেখানেই কাদাটুকু লাগায়। ঠিকভাবে লাগিল কিনা দেখিয়া আবার উড়িয়া যায়।

ঘর তৈরী হইয়া গিয়াছে। এবার সে ঘরের প্রবেশপথে আসিয়া বসিল, শুঁড় ভিতরে চালাইয়া দিয়া কোথাও উঁচু নীচু আছে কিনা পরীক্ষা করিল। সহজে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নয়।

উহার সতর্কতার কথাই চিন্তা করিতেছিলাম; এমন সময় দেখি কোথা হইতে মুখ ও পায়ের সাহায্যে এক লম্বা, সবুজ রঙের কীট ধরিয়া

লইয়া ফিরিতেছে। সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে এমন আলগোছে উহাকে প্রবেশ করাইল যে, দরজার কোন অংশে ওর শরীর স্পর্শ হইল না।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম—"এটি তোমার জলখাবার বুঝি?" অল্পক্ষণ পরেই ও আবার একবিন্দু কাদা মুখে লইয়া ফিরিল এবং সেই ছিদ্রেরই উপর বসিয়া পড়িল। এখন আবার কি করিতেছে? যতক্ষণ বসিয়া রহিল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। উড়িয়া গেলে দেখিলাম ছিদ্র বন্ধের আয়োজন হইতেছে।

এতক্ষণে ব্যাপার বোঝা গেল। ওটি কোন ভক্ষ্যজীব নহে। নিজেরই গুটি। কিন্তু গুটি পূর্ণাবয়ব হইয়া বাহির হইবে কখন? পরিণত হইয়া গেলে দরজা ভাঙ্গিয়া মা সন্তান লইয়া যাইবে; কিন্তু ততদিন ও নিজে থাকিবে কোথায়? আর, ও কি করিয়া জানিবে, কতদিন পরে তাহার সন্তানের এই দ্বিতীয় গর্ভবাস শেষ হইবে? যদি বা দিনের সংখ্যা জানে, গুণিবে কিসের সাহায্যে? আমার ঘর হইতে একদিনের জন্য যদি দেয়াল পঞ্জিকা অন্তর্হিত হয়, তবে দিনে দশবার তারিখ জিজ্ঞাসা করিয়া মরি। দেয়ালে, টেবিলে, আলাদা আলাদা ক্যালেণ্ডার। কিন্তু কুমুরে স্মৃতিসাহায্যে দিন গুণিবে? সময়ের প্রবাহ পরিমাপক কি যন্ত্র ওর আছে? মানুষ যে সব জীবকে গণনার মধ্যে ধরে না, কত বিষয়ে তাহারা মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ। অল্পে অল্পে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু স্বপ্নেও সেই একই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম—কুমুরে গুটি লইয়া উড়িয়া আসিতেছে।

"এখন আবার কি হচ্ছে?"—মুখ দিয়া এই কথা হঠাৎ বাহির হইবার কারণ ছিল। যথানিয়ম দুপুরের বিশ্রামের জন্য ঘরে ঢুকিতেই দেখি, প্রথম ঘরের গা ঘেঁসিয়া কুমুরে আর একখানা নূতন ঘর তুলিয়াছে প্রশ্ন তো করিলাম কিন্তু উত্তর দিবে কে? কারো কথায় কান দিবার ওর

ফুর্সৎ কোথায়? একমনে কাজ করিয়া যাইতেছে। দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ঘরও সম্পূর্ণ হইল। পূর্ব্ববারের ন্যায় এর মধ্যেও আর একটি গুটি ঢুকাইয়া সে ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিল। এই গুটি ও আনে কোথা হইতে? ছাদে উঠিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কোন্ দিকে ও উড়িয়া যায়, কিন্তু কিছু ঠাহর হইল না। অবশ্য কাদা যে আমাদের বাগানের গর্ত্ত হইতে আনে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বাগানে গিয়া দেখিলাম গর্ত্তের মাটি প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে, কুমুরে খুঁজিয়া পাতিয়া একেবারে ভিতর হইতে নরম মাটি লইয়া আসে। বলিহারি বুদ্ধি!

প্রায় পনরদিন নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া কুমুরে ছয়খানি ঘর নির্ম্মাণ করিল এবং তাহাদের মধ্যে ছয়টি গুটি বন্ধ করিল। ইহার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সবকিছু জানিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমায় একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু জানিবার কোন পথই যে নাই।

এখন সাত নম্বর ঘর তৈয়ার হইতেছে। আরও গুটি আছে নাকি? কত ডিম দেয় ও একসঙ্গে? নিজে থাকে কোথায়? একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে অথবা ঘর তৈরীর সঙ্গে তাল রাখিয়া ইচ্ছামত ডিম পাড়িতেছে? মায়ার এক বিচিত্রতর ইন্দ্রজাল এই পতঙ্গের জীবন!

"আজ চা-টা পাওয়া যাবে, না···কুমুরে-ফিল্ম চলতেই থাকবে দিনরাত ধরে?"

চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি, স্বামী নিকটে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। চারটা বাজিয়া গিয়াছে অথচ আমার খেয়াল নাই। তিনটার সময় চা খাওয়া ওঁর অভ্যাস। আজ এক ঘণ্টা চায়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষকালে অফিস হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, আমার

তন্ময়তা সকলের হাসিতামাশার খোরাক জোগাইতেছে। সত্য সত্যই মনের দূরতম গহন পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র প্রাণী জুড়িয়া বসিয়াছিল। রাত্রিদিন এক ভাবের ঘোরে কাটিতেছে। স্বামীর প্রতি এই অবহেলায় মনে অনুতাপ হইল।

চা-পর্ব্ব শেষ করিয়া আবার শয্যা নিলাম। গরমের জন্য পাখা খুলিয়া দিয়াছিলাম। পাখার বোঁ বোঁর সঙ্গে আর এক বোঁ বোঁ মিলিতেই পাশ ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি কুমুরে আর এক গুটি মুখে লইয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু এবার বড় শক্ত পাল্লা। এ যেন নৌকার ঘূর্ণীতে পড়া অথবা জাহাজের উপর টর্পেডোর আঘাত। একে তো বেচারী গুটির ভারেই হিমসিম খাইতেছে। তার উপর বিজলীর পাখার প্রবল বায়ুস্রোত! উপর হইতে তাহাকে নীচে নামিতে হইবে, কিন্তু এতটুকু নামিতে না নামিতে হাওয়ার বিষম তোড় তাহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। বহু সন্তান প্রসবে শীর্ণা ভারপীড়িতা গর্ভিণী কতক্ষণ এই অসম দ্বন্দ্বে যুঝিতে পারিবে!

ইচ্ছা হইল পাখা বন্ধ করিয়া দিই। কিন্তু দয়াধর্ম্ম যৌবনের কৌতূহলের নিকট পরাভব স্বীকার করিল। দেখাই যাক না এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ও কি করিয়া উত্তীর্ণ হয়?

বায়ুর প্রবাহের উপরে ও উড়িতেছিল। বারকয়েক ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবার পর আবার গাছকোমর বাঁধিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তে অবতরণ করিল। হাওয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতে চাহিল আর সে দৃঢ়ভাবে পাখা মেলিয়া ধাক্কা সামলাইয়া অগ্রসর হইল।

এবার কুমুরে পাখার ঠিক সামনে আসিয়া পৌঁছিল বলিয়া। কিন্তু আমার মনে হইল যেন মাতালের মত তাহার পা ও পাখা টলিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে। বোঁ বোঁ শব্দে পাখা

ঘুরিতেছে, ভর্‌র্‌র্‌ শব্দে কুমুরে আগাইয়া আসিতেছে। যেন দুইখানি যুদ্ধ-বিমান।

হঠাৎ পাখা একটু জোরে চলিল। কুমুরে তাল সামলাতেই না পারিয়া পাখারই চারিপাশে পাখার সমান বেগে ঘুরিতে লাগিল। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—"পাল্লা দিয়ে ছুটতে খুব মজা লাগছে বুঝি ?" বলিয়াই বুঝিলাম গতিক সুবিধার নয়। মনে হইল ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক গতির অপেক্ষা বহুগুণ বেগে পাখার চারি পাশে যন্ত্রচালিতবৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সংজ্ঞালোপ পাইতেছে। রেল-গাড়ীর সঙ্গে গরুর গাড়ী জুড়িয়া দিলে কি অবস্থা হয় ?

নাঃ, এবার পাখা বন্ধ করিতেই হইবে। উঠিয়া সুইচ ঘুরাইয়া দিলাম। পাখা বন্ধ হইল কিন্তু কুমুরে কোথায় ? উপরে তো উড়িতেছে না ? নিচে মাটির পানে চাহিলাম। হায় হায়, সন্তান সমেত জননীর প্রাণহীন দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছে। হাতে তুলিয়া লইলাম, কাটা অংশ দুটি পাশাপাশি রাখিলাম, কিন্তু সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

সদ্যজাত সন্তানসহ প্রসূতিকে মরিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র জননীর আকস্মিক অকালমৃত্যু আমাকে ততোধিক বিচলিত করিয়া তুলিল। অশ্রু আর বাধা মানিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। আমি বিমনা হইয়া বসিয়া আছি! ঘরে আলো নাই। হাসিতামাশায় মনের ভার লাঘব করিবার জন্য স্বামী আসিয়া বলিলেন, "তাহলে, লাহোর থেকে কাঁদবার জন্য কতলোক আনতে পাঠাব ?"

কোন রকমে আত্মসম্বরণ করিয়া আমি উত্তর দিলাম—"যত সব অলক্ষুণে কথা, আমার ভরা সংসারে ওসব অমঙ্গলের দরকার ?"

"তোমার সই কুমুরে বেচারী মারা গেল যে। তার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধানের কোন দরকার নেই বুঝি!"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমার মুখেও ক্ষীণ হাসির আভাস দেখা দিয়া পরক্ষণে মিলাইয়া গেল। আমি ধরা গলায় বলিলাম—"আহা বেচারী কি পরিশ্রমে এক সংসার বসালে, কিন্তু ভোগ করবার আগেই চলে গেল। মরবার সময়ও হয়ত নিজের বাচ্চাদের কথাই ভেবেছে।"

আমার চোখ ছল ছল করিতেছিল, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে তাহার আভাস পাইয়া তিনি পুনরায় পরিহাস তরল কণ্ঠে বলিলেন—"আমি বলি কি, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ডেকে এক সভা করা যাক। আর তুমি এই পরমশোকাবহ ঘটনা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দাও।"

পরদিন মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের জন্য কামরায় গেলাম। ঘর খালি খালি মনে হইতে লাগিল। গুমোট সত্ত্বেও আজ আর পাখা চালাইলাম না। পাখার উপর মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

পাখা হইতে চোখ কুমুরের বাসায় গিয়া পৌঁছিল। ছয়টি ঘর তেমনি বন্ধ, সাত নম্বরের দরজা খোলা। যেন কোন ডাকাত পথিকের জিহ্বা কাটিয়া দিয়াছে, পথিক সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে চায়, মুখও খুলিয়াছে, কিন্তু বাণী নাই—মূক বেদনায় তাহার মুখ মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

গোল গম্বুজের মত ক্ষুদ্র ঘর—অতি ক্ষুদ্র তাহার প্রবেশ পথ। দুই-ই শূন্য বিকল হৃদয়ে গৃহস্বামিনীর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই প্রতীক্ষা অব্যক্ত ক্রন্দনের মত আমাকে এমন আকুল করিয়া তুলিল যে, মনে হইতে লাগিল, পারিলে ক্ষুদ্র পতঙ্গ হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করি। মনের অস্থিরতা হেতু একভাবে অনেকক্ষণ থাকা যাইতেছিল না। উঠিয়া আসিয়া কুমুরের

ঘরের নিকটে দাঁড়াইলাম।

খোলা ঘর হইতে দৃষ্টি ক্রমে বন্ধ ঘরে গিয়া পড়িল। সবুজ নরম নরম ছয়টি গুটি ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল—এই সব গুটি কখন পরিণত হইবে? ভাবিতেই শরীরে এক তড়িতপ্রবাহ খেলিয়া গেল। এরা এই বন্দিশালা হইতে বাহির হইবে কি করিযা? মা থাকিলে যথাকালে দরজা খুলিয়া দিত, কাঁধে পিঠে করিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইত কিন্তু এখন? রুদ্ধ দ্বার গৃহে এই সব পতঙ্গ-শাবক কি শ্বাসরুদ্ধ হইযা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে?

আমার নিজের জীবনের এক হৃদযবিদারক ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হইল। কোয়েটায় যখন ভূমিকম্প হয, আমি তখন সেখানে। নিজের ঘরে নিদ্রিত ছিলাম। পাশে বোনঝি রমা। অকস্মাৎ ধরণী টলিয়া উঠিল, সমস্ত ঘর হুমড়ি খাইয়া আমাদের উপর পড়িল। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিলাম জানি না, জ্ঞান হইলে রমার ক্ষীণ আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলাম। কি যে হইযাছে, সহসা বুঝিতেই পারিলাম না। আন্দাজে এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া নিজের অবস্থা অল্পে অল্পে হৃদযঙ্গম হইল। মেঝের উপর দেয়ালের গা ঘেষিযা পাতা বিছানায় আমরা শুইযাছিলাম। ছাদের এক কড়ি আড়াআড়িভাবে আমাদের উপরে আসিযা পড়িযাছে। রমা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। নিবিড় অন্ধকারে কিছু দেখিবার তো যো ছিল না। আমি হাতড়াইয়া রমার পাশে পৌঁছিলাম ও তাহাকে বুকে তুলিযা লইলাম। রমা জল চাহিল, কিন্তু কোথায় জল? মৃত্যু হিংস্র পশুর মত করাল দংষ্ট্রা ব্যাদন করিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। উদ্ধারের কোন উপায় নাই। রমা "জল" "জল" করিতেছে· আমার দু'নয়নে জলধারা বহিতেছে। ধীরে ধীরে বালিকার ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া আসিল। ছটফট করিতে করিতে সে শেষে চিরদিনের

মত নীরব হইয়া গেল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কোন সাড়া পাইলাম না। আমার আর্তস্বর সেই কারাগার ভেদ করিয়া বাহিরে পৌঁছিতে পারিল না।

তৃতীয় দিনে লোকজন আসিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমাকে সেই জীবন্ত সমাধি হইতে উদ্ধার করিল, কিন্তু খুকীর জীবনদীপ ততক্ষণে অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। বাছা আমর ঝরা ফুলের মত মৃত্যুর তাপে একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছিল।

রুদ্ধদ্বার ঘরগুলির সামনে দাঁড়াইয়া আমি আবার রমার মরণাহত করুণ ক্রন্দন শুনিতে লাগিলাম, চোখের উপর তাহার বৃন্তচ্যুত নিদাঘদগ্ধ পুষ্পকোরকতুল্য মুখচ্ছবি ভাসিতে লাগিল। রোমে রোমে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতেছে। আমার রমার মত এই সব শিশুও কি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবে?

এখন আমি কি করি? কিছু করিতে যেন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি নরুণ লইয়া আসিলাম। ইচ্ছা ছিল সাবধানে দরজার পর্দা কাটিয়া টর্চ ফেলিয়া ভিতরের অবস্থা দেখিব। তাহারই উদ্যোগ করিতেছি, ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কি কচ্ছো বৌ-দিদি?"

"হীরা, এই সব ঘরে কুমুরের গুটি বন্ধ হয়ে আছে। ওদের মা মরে গিয়েছে। মুখ খুলে আমি ওদের বেরুবার পথ করে দিই?"

"এমন কাজ করো না বৌদি। গুটি কখন পাকবে, তাকি তুমি জান? কাচা অবস্থায় গায়ে হাওয়া লেগেছে কি মরেছে।"

তাই তো! আমি নরুণ রাখিয়া দিলাম।

গুটি পাকিবার সময় কি করিয়া জানিব? আমাদের বাগানের মালিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সেও কিছু বলিতে পারিল না।

ড্রাইভার পাঠাইয়া এক ডিমওয়ালাকে আনাইলাম। অনেকক্ষণ তো সে আমার কথাই বুঝিতে পারিল না। বহুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া শেষ কালে এই মুল্যবান উপদেশ দিল—"মরে তো মরবে, আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বউরাণী ?"

জীবনে যে স্বযং হাজার হাজার ডিমের প্রাতরাশ করিয়াছে, তাহাকে আমার ব্যাকুলতা বুঝাই কি করিয়া ?

"মালি, চার পাঁচটি কুমুরে ধরে আন। সাবধানে ধরবি, যেন পাখা থেঁতলে না যায়। বকশিশ পাবি।" জানি না ও কি করিয়া তিনটি কুমুরে ধরিয়া আনিল। আমি কামরার সব ঝরোকা বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া উহাদের ছাড়িয়া দিলাম। দুরুদুরু বুকে উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম আগ্রহে, উত্তেজনায় আমার দম আটকাইয়া আসিতেছিল, মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছি। কতবার যে তাহারা ঘরের মধ্যে চক্কর কাটিল, তাহার লেখাজোখা নাই, কিন্তু মাটির বাসাগুলি যেন তাহাদের নজরেই পড়িল না। কোন রকমে তাহারা প্রাণ লইয়া পলাইতে ব্যস্ত।

কি করিয়া এদের আমার অধীরতা বুঝাই। সেই যুগ ছিল ভাল যখন পশুপক্ষী মানুষের ভাষা বুঝিত। এক পলকের জন্য কি সেই হারানো যুগ ফিরিয়া পাই না যাহাতে আমার অন্তর্বেদনা ইহাদের গোচর করিতে পারি ? মালিকে আবার ডাকিলাম। সে একটি কুমুরে ধরিয়া বন্ধ ঘরের সারির উপর বসাইয়া দিল, কিন্তু বৃথা। এ যেন বিদ্রোহীকে রাজভক্ত করিবার প্রযাস। নিরাশ হইয়া ঝরোকা খুলিয়া দিলাম। তাহারা পলাইয়া বাঁচিল।

এখন কি করি।

পরদিন মালিকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলাম। এই রকম ঘর কি

বাগানে আর কোথাও তাহার নজরে পড়িয়াছে? তৃতীয় দিনে মালি আমাকে এমনই আটখানি কুমুরের বাসার সন্ধান দিল। আমি স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিলাম। মালিকে বলিলাম, মা কখন আসে, কি করে, লক্ষ্য করিয়া যেন আমায় সংবাদ দেয়। আমার রকমসকম দেখিয়া তাহার বোধহয় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাহস ছিল না। আমার কথামত রোজ ঘরগুলি দেখিয়া আসিত। তিনদিন পরে আসিয়া জানাইল, "কোন ঘরেই তো কুমুরে আসতে দেখিনে বৌরাণী।"

—"তুমি দেখতে থাক। একদিন না একদিন এই সব গুটির তো বাচ্চা হয়ে বেরুবার সময় আসবেই? তখন নিশ্চয়ই ওদের মা আসবে।"

কিন্তু ঝির কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল—"সব ঘর তো একসঙ্গে তৈরী হয়নি যে সব বাচ্চা একসঙ্গে বেরুবে? বাগানের বাসায় গুটি পাকতে পাকতে হয়ত এখানকার বাসায় সবগুটি দম আটকে মারা যাবে।"

তবে উপায়? কে বলিবে ঘরগুলির মধ্যে গুটি পরিণত হইতেছে অথবা এতদিনে মরিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যের বিজয়পতাকা জলে স্থলে আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু সামান্য সামান্য বিষয়ে সে কত অসহায়।

পুঁথিপত্রে এই বিষয়ে হয়ত কিছু মিলিতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ বড় বড় পুস্তক-প্রকাশকদের তালিকা আনাইয়া দেখিতে বসিয়া গেলাম। প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে দশবারখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। সবগুলি ভি-পীতে পাঠাইবার অর্ডার দিয়াছিলাম। স্বামী বলিতেছেন, কোথাও কিছু মিলিবে না। না হোক, পরিশ্রম করিয়া

মরিতেছি। কিন্তু কিছু না করিয়া যে আমার সোয়াস্তি নাই। কখন কখন স্বামী বিরক্ত হইয়া উঠেন, "দিন রাত এ কি পাগলামো।" আমার মন যে কি করিতেছে তাহা আমিই জানি। আমি যে আর কিছু ভাবিতেই পারিতেছি না। চোখের সামনে রমার মরণ-বিকৃত মুখ ভাসিতেছে। বই আসিতে ক'দিন লাগিবে জানি না। ততদিনে কি হইবে? গুটিগুলি বাড়িতেছে অথবা মরিয়া গিয়াছে?

ন্যায়ের জয়

হজরত মুহম্মদের দৈবাদেশ প্রাপ্তির অল্পদিন পরের কথা। দু'চারজন নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশী ছাড়া এখনও বড় একটা কেহ নবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করে নাই। এমন কি তাঁহার কন্যা জামাতাও না। তবে জয়নাবের মন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিবাহ আগেই হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে যখনই পিতৃগৃহে আসিতেন, পিতার মুখে ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিতে পাইতেন। বিদ্যুদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, প্রত্যক্ষদর্শনপ্রসূত আন্তরিকতায় ভরা বাণী ;—এ যেন নূতন মানুষ, নূতন এক জ্যোতিরুদ্ভাসিত জগতের বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে ; অমৃতনিষেকে পুলকস্পন্দনে প্রাণমন শিহরিয়া উঠিতেছে। ভাবের ঘোরে আত্মবিস্মৃত জয়নাব নিজের অজ্ঞাতসারেই নূতন পথে পা বাড়াইলেন। কিন্তু ধর্ম্মপথে স্বামীর ভালবাসাই প্রবল বাধা।

আবুল আস সাদাসিধা সুস্থ সবল সংসারী মানুষ। পৃথিবীতে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নেশাই নাই। ঘরে স্ত্রী, বাহিরে কলচালানী কারবার —এই তার জগৎ। নেশায় ও পেশায় মিলিয়া তাহার জীবনটা এমনই

ভরাট করিয়া তুলিয়াছিল যে, পরলোকের ভাবনা মাথায় গলাইবার মত এতটুকু ফাঁক বা ফুরসৎ পাইত না। সরলবিশ্বাসী, পরিশ্রমী, এক কথার মানুষ আবুল আস—ব্যবসায়ী মহলে সততার সুনামে তাহার জুড়ি নাই। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাহার অনুরাগ সততার খ্যাতিকেও হার মানাইত। জয়নাব উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। নবধর্ম্ম তাঁহার প্রাণমন অধিকার করিয়াছে, এক অপূর্ব্ব দিব্যানুভূতি সমগ্র চেতনাকে আবিষ্ট করিয়া প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু স্বামী তো ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না। স্বর্গ ও সংসারের দ্বন্দ্বে স্বামী-প্রেমমুগ্ধা নারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দ্বিধাসংশয়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরণীর ন্যায় আন্দোলিত হইয়া জয়নাবের দিনরাত্রি যেন কণ্টক-শয়নে কাটিতে লাগিল।

পতির সংসারে সকলেই মূর্ত্তিপূজক। মুহম্মদমণ্ডলীকে সমগ্র সমাজ বিষম বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। অঙ্কুরেই ইহাদিগকে উৎখাত করিতে হইবে। এমন অবস্থায় জয়নাব নিজের মত পরিবর্ত্তনের কথা কাহাকেও জানাইতে সাহস করেন না। কোনদিন যাহার নিকট কিছু লুকাইতে হয় নাই, আজ জীবনে প্রথমবার তাহার নিকট হইতেই ভাব গোপন করিবার প্রয়োজন হইল। পরমত-সহিষ্ণুতা সংসারে চিরকালই বিরল। তখনকার দিনে তো মৌখিক উদারতাও ছিল না। সর্ব্ববিধ মতভেদের একমাত্র সমাধান শাণিত তরবারী। কথায় কথায় রক্তের নদী বহিত; গোটা এক একটা পরিবার নিঃশেষে ধরণী পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইত। যে মরুচারী ক্ষাত্র-বীর্য্য ধর্ম্মমন্ত্রে সংযত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তীকালে দুর্ব্বার সাগরোর্ম্মির মত দিগদিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, তাহা তখন আত্মহননে ব্যাপৃত। না ছিল ধর্ম্মের একতা, না ছিল রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি। হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা, অপমানের পরিবর্ত্তে হত্যা, ধনের ক্ষতিপূরণে হত্যা—মানবরক্তেই সর্ব্ব-গ্লানি মুছিতে হইবে। শোণিত-পিপাসু সমাজ, কথায়

কথায় অসির ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠে। এই অবস্থায় জয়নাব যদি প্রকাশ্যে পিতৃধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবে শক্তিশালী আবুল আস গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসীমণ্ডলীর শোণিত-পঙ্কিল সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কিন্তু বাহিরের এই অবশ্যম্ভাবী ঝটিকা জয়নাবের অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

কিছুকাল নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জয়নাব কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ধর্ম্মানুরাগ বিরলবস্তু। লক্ষের মধ্যে একজনের হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাহার শক্তি এমন যে একের অনুরাগ লক্ষের উদাসীনতার তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়ায়। সুপ্ত ধর্ম্মপ্রীতি যখন জাগে, তখন বহুদিনের ক্ষতি একদিন পোষাইয়া লয়। জয়নাব পিতার নিকট দীক্ষিত হইবার স্থির সঙ্কল্প লইয়া উপস্থিত হইলেন।

দুপুরের চোখ-ঝলসানো রোদ। এমনই তার তেজ যে চাহিলে চোখ জ্বালা করিয়া আসে। হজরত মুহম্মদ চিন্তাসমুদ্রে ডুবিয়া আছেন। চারিদিকে নিরাশার অন্ধকার। খুদেজাও মাথা নোয়াইয়া একমনে বুঝিবা দুরদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন। মন ভারগ্রস্ত কিন্তু বসিয়া থাকিলে তো চলে না। উঠিয়া গিয়া এক ছেঁড়া জামা লইয়া আসিলেন ও তাহাতে তালি লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। ধনসম্পত্তি যা কিছু ছিল, প্রায় সমস্তই আহুতি হইয়া গিয়াছে। শত্রুদের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশ্ববাসিগণের দুর্দ্দশার নিত্য নূতন কাহিনী সাহসীকেও অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। স্বয়ং হজরতের পক্ষেও ঘর হইতে বাহিরে আসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। লোক 'মুসলিম'-দিগের ঘর জ্বালাইতেছে, মারপিট করিতেছে, সম্পত্তি লুটিয়া লইতেছে। বিপত্তির ভারে তরণী টলমল কিন্তু হজরতের বিশ্বাস অটুট। যিনি পথ দেখাইয়াছেন, তিনিই কাণ্ডারী হইবেন,—এই আশ্বাস অবলম্বন করিয়া, অনুগামীদিগকে অভয়বাণী শোনাইয়া, ধ্যান ধারণা প্রার্থনায় তিনি

দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু সময় সময় প্রবর্ত্তকদের হৃদযেও সংশযের ছায়া পড়ে। খুদেজা নতমুখে সেলাই করিতেছিলেন। হজরত বলিলেন, "এখানে আমাদের আর থাকতে দেবে না। নিজের জন্য সব সইতে পারি, কিন্তু বন্ধুদের দুর্গতি আর চোখে দেখা যায় না।"

খুদেজা জবাব দিলেন, "কিন্তু আমরা চলে গেলে এদের যে আর কোন আশ্রয় থাকবে না।"

হজরত—আমি তো একেলা যেতে চাইছি না। এখানে সব ছড়িয়ে আছে। একজনের ওপর আক্রমণ হলে, অন্যেরা খবরও পায় না। এমন যদি ব্যবস্থা হয় যে, সব একসঙ্গে এক জায়গায় এক পরিবারের মত থাকে, তবে সেই দিকেই সুবিধে। সেই কথাই ভাবছিলাম ক'দিন থেকে।

এমন সময় জয়নাব আসিতেছেন দেখা গেল। সঙ্গে কেহ ছিল না। এমন তন্ময়ভাবে দ্রুত পাদচারণ করিতেছিলেন যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন কোথাও হইতে পলাইয়া আসিতেছেন। খুদেজা উঠিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া পাশে বসাইলেন। প্রশ্ন করিলেন—"এমন উতলা কেন মা ? সব ভাল তো ?"

জয়নাব নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা শোনাইলেন। বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া শেষকালে দীক্ষিত হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন।

হজরতের চক্ষুও অশ্রুশূন্য ছিল না। তিনি উত্তর দিলেন, "আমার কাছে এর চেয়ে আনন্দের কথা কি হতে পারে, মা ? কিন্তু তোমার যে বড় কষ্ট হবে।"

জয়নাব দৃঢ়চিত্তে বলিলেন—"আমি সব কিছু সইতে প্রস্তুত হয়েই

এসেছি। সংসারের মুখ চেয়ে ধর্ম্মের আহ্বান অবহেলা করতে আর পারিনে।"

হজরত—জয়নাব, ধর্ম্মপথে পদে পদে কাঁটা বিঁধবে।

জয়নাব—কাঁটার পথই আমি বেছে নিলাম, বাবা।

হজরত—ভাল করে ভেবে দেখ ; শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

জয়নাব—তার বদলে সকল আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয় তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে ?

হজরত—কিন্তু আবুল আস ?

জয়নাবের চক্ষে এবার শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল। মনে মনে সহস্রবার যাহা তোলাপাড়া করিয়াছেন, পিতার প্রশ্নে তাহাই যেন নূতন হইয়া দেখা দিল। সামলাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণ কম্পিত স্বরে বলিলেন—"বাবা, ওঁর জন্যেই আমি মন স্থির করতে পারছিলাম না। এতদিন দোটানায় কেটে গিয়েছে। নইলে কবে চলে আসতুম। যিনি আমাকে এই নূতন পথে চলবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তিনিই আমাকে বিচ্ছেদ ব্যথা সইবার শক্তি দেবেন। হয়ত একদিন ওঁর মতি ফিরবে ; নবধর্ম্মের শরণ নেবেন।"

হজরত বলিলেন—"আবুল আস সরল, সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব কিন্তু ঈশ্বর-বিমুখ। কোন রকম অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে মন দিতে চায় না। বলে—খামোখা ঈশ্বর ঈশ্বর করায় লাভ কি ? এমনিতেই বেশ আছি। বিবেক আর বুদ্ধি এই দুটিই জীবনে পথ দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট।—পাষণ্ডের পক্ষে ধার্ম্মিক হওয়া তেমন কঠিন নয়, কিন্তু মুক্তবুদ্ধি ধীরস্থির নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সহজে ধর্ম্মের উন্মাদনা অনুভব করে না।

জয়নাব কম্পিত হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া বলিলেন—"আমি সব জেনে

শুনে, সব আশা ছেড়ে পরমেশ্বরের শরণ নিলাম বাবা : সংসারের কোন প্রলোভন আমার ধর্ম্মপথে বাধা না হোক, এই আশীর্ব্বাদ করুন।” হজরত পরিপূর্ণ হৃদয়ে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—“জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন মা। খুদা হাফিজ।”

পরদিন যথারীতি মসজিদে জয়নাব কলমা পড়িয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

কুরেশীগণ আগে হইতেই জ্বলিয়া ছিল। এখন যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইসলামের সাহস যে বাড়িয়া যাইতেছে! এতদিন চুণোপুঁটি শিকার করিয়া এবার রুইকাতলা গাঁথিবার মতলব দেখিতেছি। যদি এমন অবস্থা কিছুকাল চলে তবে কাহারও মঙ্গল নাই। সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য আবুল আসের গৃহে এক মজলিস বসিল।

ইসলাম-বিরোধীদের মধ্যে প্রধান আবুসিফিয়ান আবুল আসকে বলিলেন—“তুমি স্ত্রীকে তালাক দাও।”

আবুল আস গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কখনও না—”

—তবে কি তুমি মুসলমান হতে চাও?

—নিশ্চয়ই না।

—তাহলে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। ওকে তার বাপের বাড়ী থাকতে হবে।

—এ কি সম্ভব নয় যে আমার স্ত্রী আমার কাছে থেকে নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্মাচরণ করে?

—নিশ্চয়ই না।

—আমার স্বজাতির কাছ থেকে এতটুকু সুবিচার, সহানুভূতি আমি আশা করতে পারিনে?

—নিশ্চয়ই না।

—তাহলে আপনারা আমাকে একঘরে করতে পারেন। আপনার যা ইচ্ছা শাস্তি আমায় দিন কিন্তু আমি জয়নাবকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তাছাড়া কারো ধর্ম্ম-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আমি অনুচিত মনে করি।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে আবুল আস? আমাদের গোষ্ঠীতে কি তোমার জন্য মেয়ে আর পাওয়া যাবে না?

—জয়নাবের মত কেউ নেই।

—তোমাকে আমরা এমন মেয়ে এনে দিতে পারি যে সৌন্দর্য্যে অপ্সরী।

—আমি সৌন্দর্য্যের উপাসক নই।

—এমন মেয়ে দিতে পারি যে সকল কাজে নিপুণ, শিক্ষাদীক্ষা শীলসহবতে অতুলনীয়া।

—আমি কোন গুণের উপাসক নই। আমি চাই শুধু ভালবাসা। যা পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। দুনিয়ায় জয়নাবের স্থান দিতে পারে এমন কাউকে দেখিনে!

—ভারী তো প্রেম! তাহলে কি তোমায় ছেড়ে চলে যেত?

—সাবধানে কথা বল আবুসিফিয়ান। আমি চাইনে ও আমার ভালবাসার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করে।

—মোট কথা তুমি সমাজকে পদাঘাত করে সমাজের বুকে বাস করবে। তোমাকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি। এই অনাচারের ফল পেতে দেরী হবে না।

আবুসিফিয়ান ও তাহার দলের লোকেরা আবুল আসকে যথারীতি শাসাইয়া বিদায় লইলে পর আবুল আস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতেছিল। আবুল আস যখন শ্বশুরালয়ে উপনীত হইলেন, তখন হজরত শিষ্যদের সঙ্গে মগরিবের নমাজ পড়িতেছিলেন। আবুল আস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনারত বিশ্বাসীগণ একসঙ্গে উঠিতেছেন, বসিতেছেন, নতজানু হইতেছেন—দেখিতে দেখিতে আবুল আসের মনে ভাবান্তর হইতে লাগিল। মহাপুরুষের উপস্থিতি প্রার্থনা-কক্ষে যে আধ্যাত্মিকতার তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিতেছিল, তাহার তরঙ্গ-জড়ধর্ম্মী আবুল আসের হৃদয়েও পৌঁছিল। তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে মণ্ডলীর সঙ্গে উঠিতে বসিতে নত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত আবুল আস অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রবাহে ভাসিয়া চলিলেন।

প্রার্থনা অন্তে আবুল আস যেন স্বপন হইতে জাগরিত হইলেন। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হজরতের নিকট গিয়া পুনরায় অভিবাদন করিলেন। বলিলেন, "আমি জয়নাবকে নিতে এসেছি।"

হজরত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তুমি কি শোননি যে, জয়নাব ইসলাম গ্রহণ করেছেন?"

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।

—এও নিশ্চয়ই জান, ইসলামে বিধর্ম্মীর সঙ্গে এভাবে বাস নিষিদ্ধ?

—এর অর্থ কি এই যে জয়নাব আমাকে তালাক দিয়েছেন?

—তাই যদি হয়?

—আমার কিছু বলবার নেই। জয়নাবের কল্যাণ হোক, খুদা ও রসুলের উপর বিশ্বাস করে তার দিন আনন্দে কাটুক। আমি চিরদিনের জন্য বিদায় নেবার আগে তার সঙ্গে একটি বার দেখা করে যেতে চাই। আর একটা কথা, আপনাদের এই আচরণের ফলে কুরেশগোষ্ঠী যদি বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, আমায় তখন দোষ দেবেন না।

—আবুল আস, আমি এখন বিবাদে জড়াতে চাইনে।

—তাহলে জয়নাবকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে আজ্ঞা দিন। তাকে ঘরে নিয়ে গেলে, স্বজনদের ক্রোধ আমারই উপর পড়বে, আপনি বিপম্মুক্ত থাকবেন।

—তুমি তোমার আত্মীয়ের চাপে জয়নাবকে ধর্ম্ম ত্যাগে বাধ্য করবে না তো ?

—আমি কারও ধর্ম্ম-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অধর্ম্ম মনে করি।

—তুমি কি বলতে চাও জয়নাবকে তালাক দিতে তোমায় কেউ বাধ্য করাতে পারবে না ?

জয়নাবকে ত্যাগ করার আগে আমি নিজের প্রাণকে ত্যাগ করব।

হজরত আবুল আসের দৃঢ়তায় আনন্দিত হইলেন। পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হইল। আবুল আস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়নাব তোমায় আমি ঘরে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনোভাব তো বদলে যায়নি ?"

অশ্রুমুখী জয়নাব জবাব দিলেন,—"ধর্ম্ম বার বার মিলে, হৃদয় শুধু একবার। যেখানেই থাকি আমি তোমারই। তোমার ঘরে আমি এসে থাকলে লোকে তোমার উপর অত্যাচার করবে না তো ?"

আবুল আস—"সমাজ যদি আমাদের মিলনের অন্তরায় হয়, আমি সমাজ ত্যাগ করব। দুনিয়ায় থাকবার জায়গার অভাব কি। তুমি তো জান, আমি ধর্ম্ম ব্যাপারে স্বাধীনতার পক্ষপাতী। আমি কখনও তোমার পথে বাধা দেব না।"

জয়নাব আবুল আসের সঙ্গে চলিলেন। বিদায়কালে খুদেজা তাঁহাকে পুরাতন কালের নষ্টাবশেষ এক মুক্তাহার উপহার দিলেন।

ইসলামের উপর বিধর্ম্মীদের অত্যাচার ক্রমে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। কুরেশীগণ এতদিন অবহেলা ভরে তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করিতেছিল ; এখন রীতিমত যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা এখন সৈন্যদল গঠনে ব্যাপৃত। হজরত মুহম্মদ শেষকালে স্থির করিলেন, মক্কা ত্যাগই শ্রেয়। শিষ্য ও অনুচরবৃন্দকে লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্র জীবন যাপন না করিলে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এক এক করিয়া সমগ্রমণ্ডলী ধ্বংস হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মদিনায় যাওয়াই স্থির হইল। আবাল্যের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া সকলে মদিনায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে কুরেশীরাও চুপচাপ বসিয়া নাই। মক্কা হইতে ইঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু মদিনাও তো আরব দেশেরই মধ্যে। যুদ্ধের যে আয়োজন বহুদিন হইতে চলিতেছিল, তাহা পুর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। একদিন আবুল আস আসিয়া বলিলেন,—"জয়নাব, আমাদের দলপতিরা ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেছেন। মুসলমানগণের দিন দিন শক্তি সাহস বাড়ছে। এখনই প্রতিকার না করলে শেষকালে সামলানো যাবে না।"

জয়নাব বলিলেন, "ওরা তো কেউ এখানে নেই। লড়বে কাদের সঙ্গে?"

—মক্কায় নেই বটে, কিন্তু মদিনাও তো আমাদেরই দেশে। আমাকে লড়াইয়ে যেতে হবে জয়নাব।

—আমিও সঙ্গে যাব।

—তুমি সঙ্গে যাবে! কি করবে ওখানে গিয়ে?

—আমি আহত মুসলমানদের শুশ্রূষা করব।

—বেশ, চলো।

ভীষণ যুদ্ধ হইল। ভাই ভায়ের সঙ্গে, পিতা পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিল। রক্তবন্ধন হইতে ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ়—ইহাই প্রমাণ করিতে প্রাণপণ করিয়াছে। শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব কোনপক্ষেই ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ছিল ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস। জিহাদে মৃত্যু হইলে পরলোকে সদ্‌গতি হইবে, জিতিলে মুসলমানদের রাজ্য স্থাপিত হইবে। এই উভয় আশ্বাস তাহাদিগের দেহে যেন শতগুণ বল বৃদ্ধি করিল। বিধর্ম্মীদের এই ধর্ম্মোন্মাদনা ছিল না—নূতনের বিরুদ্ধে আক্রোশ ছাড়া আর কোন প্রেরণা ছিল না। কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধ হইবার পর কুরেশীগণ হারিয়া গেল। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আবুল আসও বন্দী হইলেন। জয়নাব স্বামীর বন্দিদশার কথা শুনিতে পাইবামাত্র, মাতার নিকট হইতে যে বহুমূল্য হার পাইয়াছিলেন, তাহাই মুক্তিপণরূপে পাঠাইয়া দিলেন।

বন্দীগণকে একে একে হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছিল। যাহাদের জন্য মুক্তি-মূল্য আসিয়াছিল, তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইল। জামাতা আবুল আস বন্দী অবস্থায় হজরতের সম্মুখে নীত হইলে হজরত বলিলেন,—"দেখলে আবুল আস, খোদা ধার্ম্মিকের সহায়। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিজয়ী হয়েছি।"

আবুল আস নির্ভিক কণ্ঠে জবাব দিলেন—"যুদ্ধে জয়পরাজয় শৌর্য্যবীর্য্যের উপর নির্ভর করে। মুসলমানগণ শক্তি সাহসের জন্যই জয়ী হইয়াছেন। হানাহানি মারামারির মধ্যে ঈশ্বরকে টানিয়া আনিবার কোন কারণ দেখি না।"

বিজিত শত্রুর তেজ সহ্য করিবার মত উদারতা সকলের থাকে না। মহম্মদ-শিষ্য একজন বলিলেন,—"ধর্ম্মের তর্ক তোমার সঙ্গে না হয় নাই করা গেল আবুল আস। কাজের কথা হোক। তোমার মুক্তিপণ কোথায়?"

হজরত জবাব দিলেন—"আবুল আসের মুক্তির জন্য এই হার এসেছে," বলিয়া মুক্তাহার সামনে রাখিলেন। আবুবকর বলিলেন, "আবুল আসের ঘরে এর চেয়ে দামী জিনিস আছে। আমরা এই হার যথেষ্ট মনে করি না।"

—কি সে বস্তু ?

—জয়নাব সেই রত্ন, যার মূল্য এই রকম লক্ষ মুক্তাহারের চেয়ে বেশী !

—তাহলে তোমাদের মতলব এই যে আমার মুক্তির মূল্য জয়নাব ?

—হ্যাঁ তাই।

—এর চেয়ে আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।

—আমরা রসুলের জামাতার প্রাণনাশ করতে পারি না। হয় তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, নয় জয়নাব। আমরা আতিথ্যের কোন ত্রুটি রাখব না।

নিজের জামাতা সম্বন্ধে কোন কিছু বলা শোভা পায় না বলিয়া হজরত নির্লিপ্তের মত সব শুনিতেছিলেন।

আবুল আসের সম্মুখে কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। শত্রুদের আতিথ্যে দারুণ অপমান, আবার জয়নাবের বিচ্ছেদে প্রাণান্তকর বেদনা। কিন্তু বীরধর্ম্মীর অভিমানই জয়ী হইল। প্রেমকে আত্মগৌরবের বেদীমূলে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়া আবুল আস বলিলেন—"তোমাদের সিদ্ধান্ত আমি মানিয়া লইলাম। জয়নাব তোমাদের সঙ্গেই থাকিবেন।"

রসুল-দুহিতার যেমন আদর সম্মান হওয়া উচিত, তার চেয়ে জয়নাব বেশী পাইতেছিলেন। কিন্তু জীবন যেন শূন্য। তিন যুগের সমান তিন বৎসর গেল; আর যেন দিন কাটে না। এদিকে আবুল আসের

আত্মীয়গণ তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবুল আস কাহারও কথায় কান দেন না। ঘরশূন্য, সুতরাং বাহিরের কাজে ডুবিয়া গেলেন। ব্যবসায়ই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জন যে ধনের লোভে করিতেন, তাহা নহে। কোন একটা উন্মাদনায় দিনরাত কাটিয়া যায় ইহাই চান। নিরাশা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়া যায়। বিরহ ব্যথা শান্ত করিবার উপায় কর্ম্মোন্মাদের মদিরা। আবুল আস কর্ম্ম-কোলাহলে জয়নাবকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

একবার মক্কা হইতে মাল লইয়া ইরাক যাইতেছিলেন। অনেক সওদাগর একত্র হইয়া মরুপথে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছেন। পথে দুস্যু-ভয় ছিল। সুযোগ সুবিধামত মুসলমানগণ বিধর্ম্মীদের ও বিধর্ম্মীগ মুসলমানদের জিনিসপত্র লুঠিয়া লইত। কয়েকবার উপর্য্যুপরি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মুসলমানগণ বিশেষ আয়োজন করিল এবং আবু আসের দলের মালপত্র লুঠিয়া, হতাবশেষ বণিকদিগকে বন্দী করিয় হজরত সকাশে উপস্থিত করিল। হজরত করুণ দৃষ্টি মেলিয়া আবু আসের দিকে চাহিলেন। অনুচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবুল আ সম্বন্ধে আপনার কি আদেশ?"

হজরত বলিলেন—"আমার জামাতা সম্বন্ধে বিচারের ভার আ নিতে পারিনে। হয়ত পক্ষপাতের সম্ভাবনা আছে। তোমরা যা ভা মনে কর, কর। আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।"

বলিয়াই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। জয়নাব কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ে পড়িয়া বলিলেন—"কত লোককে আপনি মুক্ত করে দিয়েছেন আবুল আসই কি শুধু আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত হবে?"

কন্যার অশ্রু মুছাইয়া স্নেহকরুণকণ্ঠে হজরত বলিলেন—"ন্যায়ের

আসনে বসে অবিচার করতে পারিনে মা। ন্যায় অন্ধ। নিয়ম আমিই করেছি, কিন্তু অন্যকে শেখাতে হলে নিজের তা মানতে হয়। আবুল আসকে আমি স্নেহ করি। স্নেহে অন্ধ হয়ে ন্যায়কে প্রেমকলঙ্কিত করতে পারব না।"

শিষ্যগণ হজরতের পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আবুল আসকে মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গভীর প্রভাব পড়িল সদ্যমুক্ত বন্দীর উপর। যুদ্ধে হারাইয়া, তর্কে হারাইয়া যাহাকে কাবু করা সম্ভব ছিল না, সেই বীরধর্ম্মী হৃদয় এই ন্যায়পরতায় অভিভূত হইয়া কলমা পড়িল--লাইলাহাইল্লাল্লা।

দুধের দাম

আজকাল বড় বড় সহরে দাই নার্স লেডী-ডাক্তারের ছড়াছড়ি কিন্তু গ্রাম্য সূতিকাগারে এখনও মেথর-পত্নীর অখণ্ড একাধিপত্য। অদূর ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কোন সম্ভাবনাও নাই। বাবু মহেশনাথ ছিলেন ক্ষুদ্র এক গ্রামের জমিদার। শিক্ষিত লোক, সুতরাং সূতিকাগৃহের শাসন-সংস্কারের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতেন; কিন্তু যে সব বাধা সামনে দেখা দিল, তাহা লঙ্ঘন করিতে সাধ্যে কুলাইল না। কোন নার্স অজ পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করিতে রাজী হয় না; যদি বা হয় তবে এত নগদনারায়ণ চায় যে, বাবু সাহেব মাথা নোয়াইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। এরপর লেডী-ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইবার সাহস রহিল না। তাদের দক্ষিণা দিতে বোধ হয় জমিদারীই বাঁধা পড়িবে। সুতরাং তিন কন্যার পর যখন পুত্ররত্নের

মুখ দেখিলেন, তখনও আবার ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো দাম্‌ড়ি ও তস্য পত্নীর শরণাগতি ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না।

অর্দ্ধরাত্রে একদিন জমিদার-বাড়ীর চাপরাশী আসিয়া দাম্‌ড়ির দরজায় এমন প্রচণ্ড হাঁক দিল যে, প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল।

দাম্‌ড়ির ঘরে এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় কয়েকমাস আগে হইতেই উদ্যোগ-আযোজন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। স্ত্রী-পুরুষে এই বিষয়ে কতবার যে কথা কাটাকাটি হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শঙ্কা ছিল এই যে, আবার যদি মেয়ে হয়, তবে সেই একখানা শাড়ী আর নগদ এক তঙ্কাই বরাতে আছে। স্ত্রী বলিত—"এবার যদি ছেলে না হয় তো কি বলছি। সব লক্ষণ ছেলের।" দাম্‌ড়ি স্ত্রীর বাক্যের প্রতিবাদ পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া বলিত—"ছেলে হবে! মেয়ে যদি না হয় তবে গোঁফ মুড়িয়ে ফেলব।" হয়ত মনে মনে তাহার এই ধারণাও উঁকি মারিতেছিল যে, স্ত্রীর জেদ বাড়াইয়া দিলে তাহার পুত্রকামনা বলবতী হইয়া সত্য সত্যই অঘটন ঘটাইয়া দিবে। এখন ভুঙ্গী বলিল—"নাও, এখন হল তো। গোঁফ মুড়াও দেখি এবার। আমার কথা গেরাহ্যিই হয় না। গোঁফ মুড়াবে, গোঁফ মুড়াবে! আমি নিজের হাতেই জঞ্জাল সাফ করে দিচ্ছি।" বলিয়া তখনই, কাঁচির অভাবে তরকারী কুটিবার ভোঁতা ছুরি লইয়া অগ্রসর হইল।

ছুরি-ধারিণী হইতে দুই পা পিছাইয়া গিয়া দাম্‌ড়ি বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, পরে করিস এখন। গোঁফ পালিয়ে যাচ্ছে কোথায়। আর মুড়ালেই কি! তিন দিনের দিন যেই সেই। শোন বলি। যা কিছু পাবি, অর্দ্ধেক বখরা।"

উত্তরে পতিব্রতা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। তিন মাসের শিশুপুত্রকে

স্বামীর কোলে ফেলিয়া দিয়া চাপরাশীর সঙ্গে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই দাম্‌ড়ি বলিল—"এই পাগলী, শোন! যেতে তো আমাকেও হবে। ঢোল বাজাতে ডাক পড়বে, কি পড়বে না! ছেলে সামলাবে কে তখন?"

"মাটিতে শুইয়ে রেখে চলে যেয়ো। আমি একবার ফুর্সৎ করে এসে দুধ খাইয়ে যাব।"

মহেশনাথের বাড়ীতে ভুঙ্গীর আদর দেখে কে! সকালে জল খাবার, দুপুরে হালুয়া পুরী, আবার বিকালে জল খাবার। নৈশ ভোজনের পর দুধ এক গ্লাস। এদিকে দাম্‌ড়ির জন্যেও দিনে রাতে তিনবার থালি যায়। নিজের ছেলেকে ভুঙ্গী দিনে-রাতে দুই তিন-বারের বেশী দুধ খাওয়াইতে আসিতে পারে না। তার জন্য গরুর দুধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নবজাত শিশু তাহার স্তনপান করিয়াই বাড়িতে লাগিল। আশা ছিল বারদিনের দিন এই ব্যবস্থা বন্ধ হইবে, কিন্তু মায়ের বুকে দুধ নেই। জমীদার-গৃহিণী বেশ সুস্থ সবল, কিন্তু এবার অকস্মাৎ দুগ্ধের উৎস শুখাইয়া গিয়াছে। অন্য অন্যবারে এত দুধ হইত যে মেয়েদের পেটের অসুখ হইয়া পড়িত। এবার একবিন্দুও নাই। ভুঙ্গীকে একাধারে প্রসূতি-পরিচারিকা ও ধাত্রীমাতা হইতে হইল। ক্ষীণ হাসিয়া গৃহিণী বলেন—"ভুঙ্গী, আমার বাছাকে তুই বাঁচিয়ে দে; যতদিন বাঁচবি তোকে কাজ করতে হবে না, বসে বসে খাবি। পাঁচ বিঘে নিষ্কর করিয়ে দিচ্ছি। নাতিনাতিনী পর্য্যন্ত তোর সুখে থাকবে।"

এদিকে ভুঙ্গীর নিজের সন্তান গরুর দুধ হজম করিতে পারে না। বার বার বমি করে। দিন দিন শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

ভুঙ্গী বলে—"বহুজী, মুণ্ডনের সময় চুড়ো নেব, এখন থেকেই বলে রাখছি।"

গৃহিণী জবাব দেন—"তাই নিস্ বাপু! অত ভয় দেখাচ্ছিস কেন? কিসের চাই—সোনার না রূপোর?"

"কি যে বল বহুজী! রূপোর চুড়ো আবার পরে নাকি? তোমার মাথা হেঁট হবে না?"

"আচ্ছা আচ্ছা, সোনারই নিস্ এখন।"

"বিয়ের সময় কণ্ঠা চাই, আর চৌধুরীর (দাম্ড়ির) জন্য তোড়া।"

"বেশ তাই পাবি। ভগবান আগে সেদিন তো দেখান।"

জমীদার গৃহে গৃহিণীর পরই ভুঙ্গীর প্রতাপ। রাঁধুনী, চাকর, চাকরাণী সকলে তাহাকে সমীহ করে চলে। গিন্নী নিজেও ভয়ে ভয়ে থাকেন। একবার তো ভুঙ্গী স্বয়ং মহেশনাথকেই ধমক দিয়া বসিল। তিনি হাসিযা চুপ করিয়া গেলেন। কথা হইতেছিল মেথরদের সম্বন্ধে। মহেশনাথ একটি বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"দুনিয়ার আর যাই হোক, মেথর তো মেথরই থাকবে। এদের মানুষ বানানো অসম্ভব।"

ভুঙ্গী তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিল—"বাবুজী মেথর তো অনেককেই মানুষ করেছে। ওদের আবার মানুষ বানাবে কে?"

অন্য সময় হইলে ভুঙ্গীর কঠিন শাস্তি হইত। আজ বাবুর রসবোধ যেন অকস্মাৎ উছলিয়া উঠিল। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ভুঙ্গী বলে কথা ঠিকই।"

ভুঙ্গীর রাজত্ব এক বৎসরের অধিক টিকিল না। ব্রাহ্মণ-দেবতারা জমীদার বালকের মেথরাণীর দুধে পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন

আরম্ভ করিলেন। ভুঁড়ি হেলাইয়া টিকি, মাথা ও হাত একসঙ্গে নাড়িয়া মোটেরাম শাস্ত্রী তো প্রায়শ্চিত্তের বিধান লইয়া আগাইয়া আসিলেন। হাসি তামাশায় তিরস্কারে প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাসিয়া গেল; তবে দুধ ছাড়াইতে হইল। মোটেরাম শাস্ত্রী শাস্ত্রী হইবার পূর্ব্বে, অনুরূপ অবস্থায় আর এক মেথরাণীর দুধেই মোটা হইয়াছিলেন। জমীদার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া বলিলেন—"প্রায়শ্চিত্ত চাই বটে। তাহলে তোমার বপুখানার কি গতি হবে শাস্ত্রীজী? মেথরাণী মায়ের দুধ এখন কি আর চাইলেই টান মেরে ফেলে দিতে পারবে?"

সবেগে শিখা আন্দোলন করিয়া ভাঁটার মত চোখ নাচাইয়া মোটে শাস্ত্রী বলিলেন—"বাবুজী যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। মেথরাণীর রক্ত-মাংসে আমার দেহ গড়া, অস্বীকার তো করছিনে, কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। জগন্নাথক্ষেত্রে ছত্রিশ জাতে একসঙ্গে বসে খায়; তা বলে সেটা এখানেও চালাবেন না কি? এই দেখুন না, অসুখে পড়লে আমি স্বয়ং জামা কাপড় না খুলেই খেতে বসি। সেরে গেলে তো আর তা চলে না। আপধর্ম্মের কথা আলাদা।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান, ধর্ম্ম বদলায়। এখন একরম, তখন একরকম।"

"তা নয়ত কি! সকলের কি ধর্ম্ম এক? রাজার এক ধর্ম্ম, প্রজার আলাদা ধর্ম্ম! আমীর গরীব এক নৌকোয চলবে কি করে? রাজা মহারাজের কোন নিয়ম বন্ধন নেই। যেখানে ইচ্ছে খায়, যত্রতত্র বিয়ে-ব্যাভার করে। ওরা হল নিয়মের বাইরে। নিয়মকানুন আমাদের মত মাঝারির জন্য।"

যাহোক প্রায়শ্চিত্ত হইল না। তবে ভুঙ্গীর রাজত্বও আর রহিল না। দান দক্ষিণা সে অবশ্য অজস্র পাইল। এত পাইল যে বহিয়া লইয়া

যাইতে একেলার সাধ্যে কুলায় না। সোনার চুড়াও মিলিল। একের স্থানে দু'খানা সুন্দর শাড়ী—মেয়েদের বেলায় যেমন পাইয়াছিল, সেই রকম সাদা-সিধা শাড়ী নয়।

সেই বৎসর প্লেগে লোক মরিতে লাগিল। সকলের আগে মারা গেল দাম্‌ড়ি, ভুঙ্গী এখন সংসারে একা কিন্তু সংসার আগেরই মত চলে। লোকে ভাবিল, ভুঙ্গী এবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। তার ছেলে মঙ্গল দুর্ব্বল, রোগাক্লিষ্ট হইলেও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অন্য ছেলেদের মত না হইলেও সে-ও ক্রমে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি আরম্ভ করিল—নধর কনিষ্ঠ জমিদার তনয়ের তুলনায় বোধ হইত যেন হাড়গিলা।

একদিন ভুঙ্গী মহেশনাথের ঘরের পরনালা পরিষ্কার করিতেছিল। কয়েক মাসের ময়লা জমিয়া জলের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। ভুঙ্গী নিজের ডান হাত পরনালার মধ্যে চালাইয়া একটা বাঁশের সাহায্যে ভিতরে নাড়া দিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া সে হাত বাহিরে টানিয়া আনিল; সঙ্গে সঙ্গে কালো এক সাপ পরনালার মুখে বাহিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লোকজন দৌড়িয়া আসিল, সাপকে মারিতে দেরী হইল না। সকলে মনে করিল, জোলো সাপ,—বিষ নাই। সেইজন্য ভুঙ্গীর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিবার তেমন কোন আবশ্যকতা কেহ বোধ করিল না। কিন্তু জলের সাপ নয়,—গেঁহু বনের। বিষ যখন ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত দেহ নীল করিয়া দিয়াছে, তখন চমক ভাঙ্গিলেও আর উপায় ছিল না। ধীরে ধীরে ভুঙ্গী চিরকালের জন্য চক্ষু বুঁজিল।

মঙ্গল এখন পিতৃমাতৃহীন অনাথ। সারাদিন মহেশবাবুর দরজার

আশে পাশে ঘোরে। ঘরে এঁটো কাঁটা এত হইত যে মঙ্গলের মত পাঁচ সাতটি বালকের স্বচ্ছন্দে পেট ভরিতে পারে। সুতরাং খাবার অভাব তাহার হয় নাই। কিন্তু মাটির সরাতে যখন তাহাকে জমিদার ও জমিদার পুত্রের উচ্ছিষ্ট ঢালিয়া দিত তখন খারাপ লাগিত। সকলে কেমন থালা বাসনে খায়, আর তার জন্য কিনা মাটির সানকি!

এতে যে কোন হীনতা বা অপমান আছে, তাহা বালকের বুঝিবার কথা নয়, কিন্তু গ্রামের ছেলেরা তাহাকে ক্ষেপাইয়া ক্ষেপাইয়া এই দুঃখবোধ জাগ্রত করিয়া দিল। কেউ তার সঙ্গে খেলিত না; যে টাটে সে শুইয়া রাত্রি কাটাইত, তাহা পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য। জমীদার বাড়ীর সামনে এক কোণের দিকে এক নিমগাছ ছিল, তাহার তলাযই মঙ্গলের আস্তানা। ছিন্ন মলিন গুনচটের একটা টুকরা, মাটির দু'খানা সরা, আর সুরেশের পরিত্যক্ত পুরনো একখানা ধুতি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় ঐ সম্বল। কনকনে শীত, আগুনের হল্কার মত লু আর মুসলধারে বর্ষণ—এই সমস্ত মাথায় করিয়া তাহার দিন কাটে। ভাগ্যের কষাঘাতে, লোকের অনাদরে বরং তাহার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালই হইয়াছে। শীততাপ সহিয়া দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা সবল। তার সমদুঃখী, সুখদুঃখের অংশভাগী একটিমাত্র প্রাণী ছিল—রোঁয়া উঠা, হাড় বের-করা এক কুকুর। বেচারা ভয়ে পথে বাহির হইত না। কুণ্ডলী পাকাইয়া দিনরাত টাটের একাংশে পড়িয়া থাকিত। একটি অবোধ অব্যক্তভাষী ইতর প্রাণী, আর একটি দুঃখে মূক অবহেলিত মানব সন্তান। ভাষার পদ বন্ধ হইলেও,—অনুভূতির পথে দু'জনে মিলিয়াছে। সেই মুক্ত পথে উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়াছিল। একে অপরকে আশ্রয় করিয়াছিল।

গ্রামের ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা জমিদারবাবুর উদারতায় তো হতবাক্!

একেবারে দ্বারের সামনে, পঞ্চাশ হাতও হইবে না, এরকমভাবে অন্ত্যজকে আশ্রয় দেওয়া? যদি এমন অনাচার চলে, তবে ধর্ম্ম টিকিবে ক'দিন? মেথরও ভগবানের সৃষ্ট—সে তো জানে সকলেই। তার উপর অন্যায় অত্যাচার না হয়, সেটা দেখিতে হয় বৈকি! কিন্তু সমাজ বলিয়া কিছু আছে তো। জমিদারের বাড়ী তো যাইতে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। গাঁয়ের মালিক, যাইতেই হয় এক-আধবার; কিন্তু এ অনাচার ধর্ম্মে সহিবে কেন?

কোথা হইতে শুনিয়া মঙ্গল সাধ করিয়া কুকুর বন্ধুর ইংরেজী নামকরণ করিয়াছিল। "টমি একটু সরে শো দিকি। আমার শোবার জায়গা রাখলি কোথায়, সারা চট তো তুই-ই দখল করলি!"

টমি প্রীত হইয়া লেজ নাড়িয়া প্রস্তাবে ও অনুযোগে সম্মতি জানাইল এবং মঙ্গলের আর একটু কাছে আসিয়া গা ঘেঁসিয়া শুইল। তাহাতেও যথেষ্ট হইল না মনে করিযা জিভ দিয়া তাহার গা চাটিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে দিন কাটে।

রোজ সন্ধ্যাবেলা মঙ্গল নিজেদের পরিত্যক্ত শূন্য কুঁড়েখানি দেখিয়া আসে। মায়ের অন্তিম নিঃশ্বাস যেন ঘরে আটকাইযা আছে; সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে মায়ের স্নেহকোমল মুখখানি, করুণ চোখ দু'টি বুঝি সন্ধ্যাতারার মত গৃহকোণে ফুটিয়া উঠে।

মাটির ঘর। অযত্নে দেয়াল পড়িয়া যাইতেছে। চালে মস্ত মস্ত ফাঁক। মঙ্গল স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য ঘরের পানে তাকাইয়া অনেকক্ষণ সেখানে কাটায়। এক অব্যক্ত বেদনায় বুক কি রকম করিতে থাকে, অশ্রু-পারাবার উথলিয়া উঠে।

একদিন কয়েকটি বালক খেলিতেছিল। মঙ্গল ও সাহচর সেখানে

পৌঁছিয়া গেল এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে সমবয়সীদের খেলা দেখিতে লাগিল, তাহাদের সোল্লাস চীৎকার শুনিতে লাগিল। সুরেশও খেলিতেছিল। একটি ছেলে পা মচকাইয়া ক্রন্দন সুরু করিতেই তাহার স্থান লইবার জন্য লোকের দরকার হইল। মঙ্গল দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সুরেশ ভাবিল তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। ওখানে তো অন্য কেহ নাই। কেহ জানিতে পাইবে না। "কিরে মঙ্গল, খেলবি ?"

"না ভাই। তোমার বাবা দেখে ফেলেন তো ? তোমার কি, আমিই শেষকালে মরি। হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করে ছাড়বে।"

"এখানে কে দেখতে আসবে। চলে আয়। আমরা সব ঘোড়সওয়ার হব, তুই হবি ঘোড়া। আয় না।"

"আমি কি সারাক্ষণ ঘোড়াই থাকব ; না আমায় চড়তে দেবে ?"

কঠিন প্রশ্ন! বালকেরা এই দিক দিয়া ব্যাপারটা দেখে নাই। সুরেশ কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—"তোকে কে পিঠে চড়াবে বল দেখি। তুই হলি মেথর।"

মঙ্গল ঝাঁঝিয়া উঠিল—"আমি কি বলেছি যে আমি বামুনঠাকুর ? কিন্তু আমার মা-ই তো তোমায় দুধ দিয়ে পুষেছিল ? সে হবে না। আমাকে যদি সওয়ার হতে না দাও, তবে কাজ নেই আমার ঘোড়া হয়ে—বাঃ।"

সুরেশ ধমক দিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"কাজ নেই হয়ে। তোকে হতেই হবে।" বলিয়া মঙ্গলকে ধরিতে ছুটিল। মঙ্গলও দে ছুট। সুরেশ প্রাণপণে পিছনে ছুটিল, কিন্তু বেশী দুধ-ঘি ও আদর খাইয়া শরীর থলথলে হইয়া গিয়াছে। অধিকক্ষণ চলিতে পারিল না। দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। শেষে হার মানিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

আবার আদেশের সুরে বলিল—"এসে ঘোড়া হ বলছি ; নইলে যখন হাতের কাছে পাব, মজা টের পাবি।"

"তাহলে তোমাকেও ঘোড়া হতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ ; তাই হব এখন। তুই তো আয়।"

"তুমি পরে কথা রাখবে না। আগে আমি চড়ে নি, তার পরে তোমায় চড়াব।"

সুরেশ ফাঁকি দিতেই চাহিয়াছিল। মঙ্গলের এই চালাকি দেখিয়া ফের চটিয়া গেল। ততক্ষণে অন্য সাথীরাও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে। সুরেশ অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"শুনলে কথা! মেথর কি না।" চোখে চোখে ইশারা হইয়া গেল এবং একসঙ্গে তিনজন তিন দিক হইতে মঙ্গলকে ঘিরিয়া ধরিল। হাত ও হাঁটু মাটিতে নোয়াইয়া দিয়া মঙ্গলকে জোর করিয়া ঘোড়া করা হইল। সুরেশ পিঠে চড়িয়া হাঁটুর গুঁতা দিয়া বলিল—"হিঁ হিঁ হিঁ, চল ঘোড়া, চল।"

কি করে, মঙ্গলকে কিছুদূর পর্য্যন্ত অশ্ব-গিরি করিতেই হইল। কিন্তু লিকলিকে চেহারার ছেলে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত একমণ মাংসের তালকে পিঠে করিয়া বেড়াইতে পারে। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"নাও, এবার নামো। আমি আর পারিনে।"

কিন্তু অশ্বারোহী এত অল্পে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তিনি জাঁকিয়া বসিলেন। মঙ্গল গা-ঝাড়া দিতেই পপাত ধরণীতলে এবং তৎক্ষণাৎ সচীৎকার ক্রন্দন আরম্ভ।

কান্নার আওয়াজ মায়ের কানে পৌঁছিতেই তিনি চাকরানী পাঠাইয়া দিলেন। এমনি তিনি কানে কম শোনেন কিন্তু সুরেশ মায়ের প্রয়োজন বুঝিয়া স্বরগ্রাম এত চড়াইতে পারিত যে স্বাভাবিক শ্রবণ শক্তিতে তালা লাগিবার জো হইত।

ফেকুর মা আসিয়া 'সোনা আমার, মাণিক আমার' করিয়া সুরেশকে লইয়া গেল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদছিস কেন, মারলে কে ?"

মা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। মঙ্গল স্বভাবতঃই নিরীহ। তার উপর অবস্থার চাপে এমন হইয়া গিয়াছিল যে, সাত চড়ে রা ফুটে না। কিন্তু সুরেশ যখন নানা রকম শপথ করিতে লাগিল, তখন বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি। মঙ্গলকে ডাকাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"মংলু, কতবার না তোকে মানা করেছি, সুরেশকে ছুঁবি না। কানে কথা ঢোকে না বুঝি ? বার করছি তোমার নষ্টামি। বল ওকে কেন ছুঁলি ?"

"আমি ছুঁইনি।"

"ছুঁসনি তো কাঁদছে কেন ?"

"পড়ে গিয়ে লেগেছে তাই।"

এ যে চোরের উপর বাটপাড়ী। দাঁতে দাঁত পিষিয়া জমিদার গৃহিণী ক্রোধ দমন করিতে লাগিলেন। মারধোর করতে গেলে স্নান করিতে হয়। তাই মঙ্গল সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। কিন্তু তিনি হস্ত প্রহারের অভাবে বচন প্রহার করিয়া সুদে আসলে পোষাইয়া লইলেন। মনের সাধে গালাগালি করিয়া শেষকালে যখন নূতন কিছু বলিবার রহিল না তখন হুকুম দিলেন—"এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যা। ফের যদি এ বাড়ীর দুয়োরে তোকে দেখি, তবে আর আস্ত রাখব না।"

অপমান যেমনই লাগুক, ভয় লাগিল বেশী। চুপ চাপ মাটির সানকি হতে উঠাইয়া লইল, টাটখানা বগলে গুঁজিয়া, ধুতি কাঁধে ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মঙ্গল বাহির হইয়া গেল। সঙ্কল্প করিল

আর আসিবে না। ক্ষুধায় মৃত্যু হয়, তবুও না! এরকম করিয়া বাঁচিয়া লাভ কি? অভিমানে আশ্রয়হীন বালকের হৃদয় ভরিয়া আসিল। একবার চোখের জল বন্ধ হয়, কিছুক্ষণ পরে আবার জ্বালা করিয়া আসে; আবার টপ টপ করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে। এক পা এক পা করিয়া অবশেষে জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পরে টমিও আসিয়া জুটিল।

দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই সূর্য্য পাটে বসিবেন। ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে আলো-রেখা মুছিয়া যাইতেছে; মঙ্গলের মন হইতে গ্লানিও তিরোহিত হইতেছে। মানসিক চাঞ্চল্য ছাপাইয়া ক্রমে ক্ষুধার তাড়না প্রবল হইয়া উঠিল। বার বার সবার দিকে দৃষ্টি আপনা হইতেই যাইতে লাগিল। ওখানে থাকিলে এতক্ষণে সুরেশের এঁটো মিঠাই মিলিয়া যাইত। এখানে খাইবার কি আছে?

টমিকে বলিল—"না খেয়ে থাকতে পারবে টমি? আমি তো অমনি শুয়ে পড়ব আজ।"

টমি কুঁ-কুঁ করিয়া জবাব দিল। মঙ্গল তার ভাষা বোঝে। টমি বলিতেছে—"এরকম অপমান তো সারাজীবন অঙ্গের ভূষণ হযে থাকবে তোমার। এইটুকুতেই যদি সাহস হারাও, তবে চলবে কেন। দেখো না, আমার অবস্থা। এই তো এক্ষুনি একটি লোক লাঠি মেরেছিল। কেঁদে কঁকিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার লেজ নাড়তে নাড়তে তারই কাছে গেলাম। আমরা দু'জনই যে এরই জন্য জন্মেছি।"

মঙ্গল—"তাহলে তুমি যাও ভাই। যা পাও খেয়ে এসো। আমার জন্য ভেবো না।"

টমি স্ব-ভাষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"কিন্তু আমি তো যাব না টমি!"

"না খেয়ে মারা যাবে মংলু?"

"তুমিই কি বাঁচবে?"

"আমার আছেই বা কে যে আমি মরলে দুঃখ করবে। যৌবনে প্রেমে পড়েছিলাম; প্রিয়া কিছুকাল পরে আমাকে ছেড়ে গিয়ে আমারই এক দোস্তের ঘরে গিয়ে উঠেছেন। কপাল ভাল ছিল যে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট ঝাড়া হাত-পা আছি। নইলে পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চার ভারে তলিয়েই যেতাম।"

কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা দ্বিতীয় এক যুক্তি বাহির করিল। আহত অভিমানকে কোন রকমে ভুলাইবার চেষ্টার ত্রুটি নাই।

"মাইজী নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করছেন। কি বলিস টমি?"

"তা নয় তো কি! বাবুজী আর সুরেশ দু'জনেরই খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়। কাহার থালী থেকে এঁটো নিয়ে আমাদের খুঁজছে।"

"বাবুজী আর সুরেশ দু'জনের থালাতেই খুব ঘি থাকে; আর সব।"

"সব কিছু শেষকালে নর্দ্দমায় ফেলে দেবে যে।"

"আচ্ছা দেখা যাক, আমাদের খুঁজতে কেউ আসে কি না।"

"খুঁজতে আসবে বই কি! গুরু ঠাকুর কি না! একবার হয়ত মংলু, বলে কেউ আওয়াজ দেবে। তারপর থালীর সব এঁটো পরনালায় ঢেলে দেবে।"

"আচ্ছা তা হলে চল। আমি কিন্তু আড়ালে থাকব টমি। মনে রেখো, যদি কেউ আমায় না ডাকে, তবে যাব না।"

দুই বন্ধু—একসঙ্গে বাহির হইয়া মহেশনাথের দরজায় অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া দাঁড়াইল। টমির তর সয় না। আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। গিয়া দেখিল সুরেশ ও মহেশবাবু খাইতেছেন।

উঠানেই বসিয়া রহিল, কিন্তু মনে ভয়, পাছে কেহ লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

চাকরদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। চমকু বলিতেছে—"আজ মংলুকে দেখছি নে তো? মাইজী আজ ধমকেছিলেন, বাবুসাহেব তাই গোসা করে অদর্শন হয়েছেন।"

চুহুয়া বলিল—"বেশ হয়েছে, বের করে দিয়েছে। সকালে উঠেই মেথরের মুখ দেখতে হয়।"

মঙ্গল আর একটু সরিয়া বসিল। নাঃ, কোন আশাই নাই মনে হইতেছে। মহেশনাথ আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। চুহুয়া হাতে জল ঢালিয়া দিল। এবার তামাক খাইবেন, তারপর নিদ্রা। সুরেশ মায়ের কাছে বসিযা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িবে। অভাগা মঙ্গলের জন্য কারো কোন মাথা-ব্যথা নাই। ভুলেও কেউ নাম লইবে না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরাশ হইয়া মঙ্গল নানা চিন্তা করিতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় কাহার পাতায় এঁটো লইয়া আসিতেছে দেখা গেল।

মঙ্গল সাগ্রহে অন্ধকার হইতে আলোতে আসিল।

কাহার দেখিতে পাইয়া বলিল—"কোথা ছিলি তুই মংলু? আমি তো ভেবেছিলাম চলে গিয়েছিস। সব আস্তাকুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম।"

মঙ্গল বিনীত স্বরে কহিল—"আমি সারাক্ষণ এখানেই বসে আছি, খুড়ো।"

"আওয়াজ দিসনি কেন?"

"ভয় কচ্ছিল।"

"আচ্ছা নে, খেয়ে নে।"

মঙ্গল সকৃতজ্ঞভাবে সানকিতে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিল।

টমি ভিতর হইতে লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া জুটিল।

দুই বন্ধু নিম গাছের নিচে একই পাত্র হইতে খাইতে লাগিল। মঙ্গল এক হাত টমির মাথায় বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"দেখলি, পেটের আগুন এমনি জিনিস বটে। দুর ছাই করে এই যা দেয়, না পেলে কি করতিস?

টমি লেজ নাড়িল।

"সুরেশকে মা বাঁচিয়েছিল, দুধ দিয়ে পুষেছিল।"

টমি আবার লেজ নাড়িল।

"লোকে বলে দুধের দাম কেউ দিতে পারে না। আমার মায়ের দুধের দাম আমি এ রকম করেই পাচ্ছি।"

টমির লেজ নাড়া চলিতে লাগিল।

সদ্গতি

দুখী চামার নিজেদের কুঁড়ে ঘরখানির সামনের দিকটায় ঝাড়ু দিতেছিল। তার স্ত্রী ঝুরিয়া ভিতরটা নিকাইতেছিল। উভয়ের কাজ যখন শেষ হইল, তখন ঝুরিয়া স্বামীকে বলিল, "এবার তুমি পণ্ডিত-বাবাকে খবর দিয়ে এসো। বেলা হয়ে গেলে হয়ত কোথাও বেরিয়ে যাবেন।"

দুখী—"এই যাই। কিন্তু এলে বসাবে কোথায়?"

—একটুক্ষণের জন্য কারো একখানা চারপাই চেয়ে আনো না। ঠাকুরদের বাড়ী পাওয়া যাবে না?

—ঠাকুররা দেবে তোকে খাটিয়া ? মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস যে হাসিও পায়, রাগও ধরে। ঘর থেকে একটু আগুন দিতে চায় না, দূরে দাঁড়িয়েও একলোটা জল চাইলে পাওয়া যায় না ; তারা তোমায় খাট পালঙ্ক দেবে! একি আমার ঘুঁটে ভূষি না জ্বালানি কাঠ যে যার খুশী উঠিয়ে নিয়ে গেল ? আমাদের যে বসবার খটোলা আছে, তাই ধুয়ে মুছে এনে রাখ। পণ্ডিতজী আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে এখন।

—পণ্ডিতজী মহারাজ কি আমাদের খটোলীতে বসবেন ভাবছ ? কি রকম নেম-ধরম মানেন সে তো জানই।

দুখী চিন্তিতমুখে সায় দিল—“বলেছিস কথা ঠিকই। আচ্ছা, এক কাজ করি না কেন। মহুয়ার পাতা খানকয়েক ভেঙ্গে নিয়ে আসছি, তাই দিয়ে একখানা আসন বানিয়ে দিই। পাতা বড় পবিত্তর বস্তু। বড় বড় নেমধর্ম্মীরাও পাতায় খেতে আপত্তি করে না। ডাণ্ডাটা আমায় দিয়ে যা দিখিন, নিয়ে আসি খানকতক পেড়ে।”

ঝুরিয়া বলিল—“পাতার আসন আমিই বানাতে পারব। তুমি এবার যাও। সিধেও তো দিতে হবে। আমাদের থালায় দিয়ে দেব নাকি ?”

দুখী এবার বিরক্ত মুখে বলিল—“তোর কি কিছুতেই আর আক্কেল হবে না ? বাবা থালাখানা ছুঁড়ে ফেলবে না ? সিধেও যাবে, থালি-খানাও চুরমার হবে। পণ্ডিতজী যা রাগী মানুষ। রাগলে নিজের স্ত্রীকেও ছেড়ে কথা কন না। ছেলেটাকে সেদিন কি মারই মারলে। না না, থালা-টালা নয়। সিধে ঐ পাতায় দিতে হবে। আর শোন, তুই ছুঁবিনে। ভুরী গোঁড়ের মেয়েকে সঙ্গে করে দোকানে যাবি, ওর হাত দিয়ে সব জিনিস আনাবি। দেখিস, সিধে যেন কম না পড়ে!

একসের আটা, আধসের চাল, একপো ডাল, আধপো ঘি, তার সঙ্গে ঠিক মাপে লঙ্কা, লবণ আর হলদি। পাতার এক পাশে চার আনা পয়সা রেখে দিবি। গোঁড়ের মেয়ে যদি আসতে না চায়, তবে ভুজিনকে কাকুতি-মিনতি করে নিয়ে যাবি। মোদ্দাকথা তুই কিছুতেই ছুঁসনে। তাহলে অনর্থ হবে।

বারবার এইভাবে সাবধান করিয়া দুখী বড় গাঁটরীর এক গাঁটরী ঘাস তুলিয়া লইল। এক হাতে নিজের লাঠিগাছা লইয়া, ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া, দুখিয়া পণ্ডিত ঘাসীরামের বাড়ীর দিকে চলিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দর্শন তো আর খালি হাতে করা যায় না। দুখী ঘাস ছাড়া আর কিই বা ভেট দিতে পারে!

ঘাসীরাম পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সকালে চোখ খুলিয়াই পাড়া সরগরম করিয়া স্তোত্র পাঠ করেন। পরে মুখ হাত ধুইয়া একলোটা ভাঙ্ উদরস্থ করেন এবং চন্দন পিষিতে লাগিয়া যান। তারপর আয়না সামনে রাখিয়া ললাটে তিলক ত্রিপুণ্ড্র আঁকেন। চন্দনের দুই রেখার মধ্যে টকটকে লাল বিন্দু দিয়া বক্ষে বাহুতে অজস্র গোলাকার ছাপ ও নামাবলী মুদ্রিত করেন। তারপর ঠাকুরজীর মূর্ত্তি বাহির করিয়া তাহাকে ধোওয়ানো, চন্দন লাগানো, ফুল দিয়া সাজানো আছে। ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি আরম্ভ করিতে না করিতে ঠাকুরপূজার মূর্ত্তিমান পারিশ্রমিকস্বরূপ দু'একজন যজমান আসিয়া উপস্থিত হন।

আজ নিত্যকার পূজাপাট সাঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, দুখী ঘাসের বোঝা লইয়া একপাশে বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাটিতে যুক্তকর ও তদুপরি মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার অন্তে পরম সম্ভ্রমের চক্ষে তেজোময় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে

লাগিল। পণ্ডিতজীর বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারা, ললাটে তিলক, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত,—ব্রহ্মতেজ ও ভাঙের প্রভাবে দীপ্ত চক্ষু। দুখী একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখে কথা নাই দেখিয়া ঘাসীরাম নিজেই প্রশ্ন করিলেন—"কি খবর রে দুখিয়া? সকাল-বেলায়ই যে?"

দুখী মাথা নোয়াইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—"মেয়ের বে ঠিক করেছি বাবা ঠাকুর। সগাই (বাগদান)-এর দিন দেখে দিতে হবে। কখন পায়ের ধূলো পড়বে?"

—আজ তো হবে বলে মনে হচ্ছে না। দেখি, যদি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারি।

—না না বাবা, আজই দয়া করতে হবে। সব ঠিক ঠাক করে রেখে তবে এসেছি। এই ঘাস কোথায় রাখি?

—গাইয়ের সামনে ঢেলে দে। আর ঝাড়ু দিয়ে দরজার সামনেটা একটু পরিষ্কার করে দে দেখি। ঝাটপাট হয়ে গেলে অমনি বৈঠক-খানাটা একটু নিকিয়ে দিবি—ক'দিন থেকে নিকানো হয়নি। ততক্ষণে আমি দুটো মুখে দিয়েনি। তারপর একটু বিশ্রাম করে তোর সঙ্গে চলব। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। ঐ যে কাঠের একটা গাঁট পড়ে আছে দেখছিস, সেটা ফেড়ে চ্যালা করে দিতে হবে। আর ঐ পাশে যে ভুসি পড়ে আছে, ধামায় ভরে তা ভুসির ঘরে রেখে আসবি। আর এক গাড়ী ভুসি আসবার কথা আছে; এলে তাও ঘরে তুলে রাখবি।

দুখী তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু যত কাজের ফরমাস হইয়াছে, তাহার সব করিতে যে দিন কাবার হইবে, দুখী প্রথমেই তাহা বোঝে নাই। ঝাড়ু দিতে, ঘর নিকাইতে, ভুসি

বহিতে যখন বেলা দুপুর বাজিয়া গেল, তখন দুখীর হুস হইল। কিন্তু সব কাজ না করিলে পণ্ডিত-বাবা তো প্রসন্ন হইবেন না।

পণ্ডিতজী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছিলেন এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ডাক আসিতেই ত্বরিত পদে ভিতরে চলিয়া গেলেন। দুখী সকাল হইতে কিছু খায় নাই তার উপর এতক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতেছে। তাহার ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘর এক মাইলের উপর দূরে। যদি খাইতে চলিয়া যায়, তবে পণ্ডিতজী হযত বিষম রাগ করিবেন, হযত তাহার বাড়ী যাইতে চাহিবেন না। ক্ষুধাকে আমল না দিয়া দুখী লাকড়ী চিরিতে লাগিয়া গেল। মস্তবড এক গাঁট। দু'চারজন যজমান ইতিপূর্ব্বে ইহার উপর শক্তি পরীক্ষা করিয়া হার মানিয়াছেন। কুড়াল ভাঙ্গে তো গাঁট ভাঙ্গে না। দুখী প্রাণপণ করিয়া কুড়াল চালাইতে লাগিল। অনভ্যস্ত পরিশ্রমে দরদর ধারায় ঘাম ঝরিতেছে, ক্ষুধায় শরীর রিমঝিম করিতেছে, তবু সে সমানে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ শুধুমাত্র মনের জোরে, যেন এক নেশার ঝোঁকে কুড়াল চালাইয়া গেল। তারপর হাত আর চলে না, পা কাঁপিতেছে, কোমর সোজা করিয়া রাখা দুর্ঘট ;— চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। ঘাস কাটা যাহার পেশা তাহার এমন মেহনত সহিবে কেন! কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইবার জন্য দুখী ভূমিতে শুইয়া পড়িল! এক চিলিম তামাক পাইলে শরীরটা হয়ত একটু চাঙ্গা হইত, কিন্তু তামাক পাইবে কোথায়? ব্রাহ্মণ দেবতারা কি আর তামাক-টামাকের ধার ধারেন। ও সব গরীব ছোটলোকের নেশা। হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল গ্রামে এক ঘর গোঁড়ও বাস করে। যদিও তারা জাতে একটু উঁচু তবু একেবারে নাগালের বাহির নয়। তাড়াতাড়ি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দুখী

তামাক ও ঘুটে চাহিল। তামাকু মিলিল, চিলিমও, কিন্তু আগুন পাওয়া গেল না। খাওয়া দাওয়ার পর তাহারা আগুন নিভাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আবার ঘুটে ধরাইবার হাঙ্গামা পোয়ায় কে! দুখী ভাবিল আগুনের ভাবনা কি। পণ্ডিতজীর বাড়ীতে এইমাত্র রান্নাবান্না শেষ হইয়াছে, ঘুটে ধরাইবার জন্য একটু কাঠকয়লা মিলিবেই।

পণ্ডিতজীর রান্নাঘর হইতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া দুখী গিয়া সসঙ্কোচে আগুন চাহিল—"একটু আগুন পাব কি বাবা? একটান তামাক খেয়ে নিতাম।"

ঘাসীরামের তখনও আহার শেষ হয নাই। ঠোঁট উল্টাইয়া পণ্ডিতানী তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগুন চাইছে কে?"

পণ্ডিত—"ঐ ব্যাটা দুখিয়া চামার, আর কে! বলেছিলাম কিছু কাঠ ফেড়ে দিতে। দিয়ে দাও একটা আংরা।"

পণ্ডিতানী নাকমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার-নিয়ম সব গোল্লায় গেল, মুচীমেথর চামার যে সে একেবারে বাড়ীর ভেতর চলে আসে। একি হিন্দুর ঘর না মুসলমানের সরাইখানা? বলে দাও হতভাগাকে চলে যেতে; নইলে মুখ পুড়িয়ে দেব। ভাল করেই আগুন দেব।"

পণ্ডিতজী পত্নীকে যথেষ্ট ভয় করিতেন। তবু অবুঝকে বোঝাইবার মত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কোন জিনিস তো ছোঁয়নি; উঠোনেই শুধু পা দিয়েছে। মাটি তো আর অশুদ্ধ হয় না। সকাল থেকে আমাদেরই কাজ করছে। মজুর ডাকলে চার চার আনা পয়সা বেরিয়ে যেত। তাও আবার ঐ গাঁট, দিয়ে দাও না একটু আগুন।"

পণ্ডিতানীর রাগ আর পড়ে না। তিনি কণ্ঠস্বর পঞ্চমে চড়াইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভেতরে এলো কেন? বাইরে থেকে চাইতে পারত না?"

—বরাত মন্দ, আর কেন?

—আচ্ছা, এবার দিয়ে দিচ্ছি। ফের যদি তুমি ছত্রিশ জাতকে বাড়ী ঢোকাবে, তো মজা টের পাওয়াব।

দুখীর কানে সব কথাই যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল—সত্যই তো! পণ্ডিতবাবার বাড়ীর ভিতরে ঢোকাটাই তার অন্যায় হইয়াছে। তাহা হইলে চামারে ব্রাহ্মণে পার্থক্য রহিল কোথায়? এরা ছোঁয়াছুত মানিয়া আলাদা আলাদা থাকেন বলিয়াই তো এত মান্য। এদের সঙ্গে বাস করিয়া চুল পাকাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু বুদ্ধি আর পাকিল না।

পণ্ডিতানী আংরা লইয়া আসিতেই দুখী যুক্তকরে ভূমিতে শির লুটাইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল—"বড় ভুল হয়ে গেছে মাইজী, একেবারে রান্নাঘরের পাশে এসে গেছি। চামারের আর কত বুদ্ধি হবে। এই জন্যেই তো লাথি ঝাটা আমাদের কপালে আর ঘুচে না। এই বারটি মাপ করো—"

পণ্ডিতানী চিমটা করিয়া আগুন আনিয়াছিলেন। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুখীকে এক ঝলক দেখিয়া লইয়া, পাঁচ হাত দূর হইতে তার দিকে কয়লা ছুড়িয়া মারিলেন। বড় একটি আংরা দুখীর মাথায় আসিয়া ঠেকিল। তাড়াতাড়ি দুই পা পিছাইয়া গিয়া দুখী পোড়া জায়গায় হাত বুলাইতে লাগিল। ভাবিল, এক পবিত্র ব্রাহ্মণের ঘর অপবিত্র করার ফল হাতে হাতে পাইয়াছি। এই জন্যই তো লোকে ব্রাহ্মণদের এত ভয় করে। আর সকলের টাকা কড়ি মারিয়া লোকে পার পাইয়া যায় কিন্তু ব্রাহ্মণের এক পয়সা রাখিয়া দিলে মহাব্যাধিতে

হাত পা গলিয়া গলিয়া পড়ে। সারা পরিবার উচ্ছন্ন যায়।

বাহিরে আসিয়া দুখী তামাক খাইল। তারপর আবার কুড়াল লইয়া পরমেশ্বরের মত অক্ষয় অব্যয় কাষ্ঠ-গ্রন্থিকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ষণ্ডা জোয়ান যজমানগণ যাহা পারেন নাই, অর্দ্ধাশনজীর্ণ সারাদিনের উপবাসে ক্ষীণ ঘাসিয়ারা সেখানে কি করিতে পারিবে! গাঁট তেমনি গ্যাঁট হইয়া রহিল, এ দিকে দুখী ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

দুখীর মাথায় আগুন পড়িয়া যাওয়াতে পণ্ডিতানী কিঞ্চিত লজ্জিত হইয়াছিলেন। বেচারীর কাকুতি-মিনতিতে তাহার মন আরও নরম হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতজী ভোজন সমাপ্ত করিয়া উঠিতেই বলিলেন—"ওকে কিছু খেতে দিলে হয়। সেই সকাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।"

পণ্ডিতজী বলিলেন—"বাড়তি রুটি হবে কিছু?"

—তা হবে দু'চারখানা।

—দু'চারখানায় ওদের কি হয়। চামার হচ্ছে, সের খানেক আটার রুটি তো খাবে নিশ্চয়ই।

আহারের পরিমাণ শুনিতেই, পণ্ডিতানীর দয়াধর্ম্ম অঙ্কুরে বিলুপ্ত হইল। কানে হাত দিয়া বলিলেন—"ও বাবা, একসের? কাজ নেই তবে, থাক।"

এবার পণ্ডিতজীর দয়াপ্রদর্শনের পালা। বলিলেন—"আটার ভুসি আছে তো? অল্প আটার সঙ্গে বেশ খানিকটা ভুসি মিলিয়ে গোটা পাঁচসাত টিক্কর তৈরী করে দাও। নূন দিয়ে খেয়ে নেবে এখন।"

পণ্ডিতানীর ক্ষণিক সহৃদয়তা সম্পূর্ণরূপে উবিয়া গিয়াছিল। তাচ্ছিল্য সহকারে বলিলেন—"থাকগে। কে আবার আগুন তাতে মরতে যায়।"

এক চিলিম তামাকের জোরে পুরা আধঘণ্টা কুড়াল চালাইল। কিন্তু মহেন্দ্রের বজ্রও বুঝি গাঁটে ঠেকিলে ব্যর্থ হইয়া ফিরিত। মাথা ঘুরিতে ঘুরিতে দুখী বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সেই গোঁড়, যাহার বাড়ী হইতে সে তামাক ও চিলিম সংগ্রহ করিয়া আনিযাছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"কেন নাহ'ক প্রাণটা দিচ্ছ খুড়ো? ও গাঁট চেরা তোমার কর্ম্ম নয়।"

দুখী প্রায়-অবশ হাতে মাথার ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "এখনও অনেক কাজ বাকী। আরো এক গাড়ী ভুসি এই এলো। সেগুলো ভুসির ঘরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।"

—কিছু খেতে দিয়েছে কি? না অমনি খাটিযেই নিচ্ছে? গিয়ে চেযে নিতে হয। ওরা হাড়-কিপ্টে; অমনি যে তোমায সেধে দিতে আসবে, সে ভরসায থেকো না।

দাঁতে জিভ কাটিয়া দুখী বলিল---"ও রকম করে বলতে নেই বাবা! ব্রাহ্মণের রুটি কি আমাদের হজম হয়?"

গোঁড় বলিল—"হজমের ভাবনা পরে। আগে পেটে পড়ুক তো। খেয়ে দেয়ে গোঁফে তা দিয়ে আরাম কচ্ছেন, তোমার উপর ঢালা হুকুম, কাঠ ফেড়ে দে। যেন চৌদ্দ পুরুষের কেনা গোলাম। এমন যে জমিদার সে-ও ব্যাগার খাটালে কিছু খেতে দেয়। জজ ম্যাজিষ্টরও কাজ করিযে মজুরী দেয়। বামুন ব্যাটারা যে কশাইয়ের এককাঠি ওপরে যাচ্ছে।"

দুখী সন্ত্রস্ত স্বরে বলিল—"চুপ কর। আমার সারাদিনের মেহনত মাটি করবি?"

কথা বাড়িবার অবকাশ না দিয়া দুখী আবার সেই গাঁট লইয়া পড়িল। কিন্তু দুই টুকরা হওয়া তো দূরের কথা, উহাতে সামান্য চিরও পড়িল না।

গৌড় তখনও দাঁড়াইয়াছিল। দুখী ধুঁকিতেছে দেখিয়া তাহার দয়া হইল। তাহার হাত হইতে কুড়ালখানা লইয়া সে প্রাণপণে চালাইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তেমন গ্রন্থিছেদক বোধ হয় ফরমাশ দিয়া তৈরী না করিলে পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ দমাদম আঘাত করিবার পর সে কুড়াল ফেলিয়া দিল। পরিশ্রমের ফলে তাহার মেজাজে আরও উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। যাইতে যাইতে বলিল—"প্রাণটা দিয়েই যাও খুড়ো, একেবারে সোজা স্বগ্‌গে পৌঁছে যাবে।"

দুখী করুণ নেত্রে সেই নির্ব্বিকার অটুট গাঁটের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষকালে উঠিয়া পড়িয়া ভাবিল—"আগে ভুসিগুলো ঘরে নিয়ে যাই। কাল এসে গাঁট ফেড়ে দিয়ে যাব। সেই সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, কাজকর্ম্ম সব পড়ে আছে। চুন্নী বোধ হয় তার মামার বাড়ী থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সে হ'ল কনে, সে তো আজ তার মাকে বেশী সাহায্য করতে পারবে না। একা একা ঝুরিয়াকেই খাটতে হচ্ছে। দুখী ধামা লইয়া ভুসি বহিতে আরম্ভ করিল।

ভুসির ঘরও বেশ দূরে। এক বোঝা পৌঁছাইয়া আসিতে মিনিট দশ লাগিয়া যায়। ধামা পুরাপুরি ভরিয়া নিলে দুখী তাহা আর মাথায় উঠাইতে পারে না। তাই অল্প অল্প করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যখন ভুসি বহন শেষ হইয়াছে তখন চারটা বাজে। দিবা-নিদ্রা হইতে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পণ্ডিতজী মহারাজ বাহিরে আসিয়া দর্শন দিলেন।

—অ্যা, দু'মুটো ভুসি ওঠাতে তুই দিন কাবার করে দিলি দুখিয়া? একেবারে কোন কর্ম্মের নস দেখছি। কাঠও তো তেমনি পড়ে আছে। যেমন তোর সেবাভক্তি, তেমনি বিয়েব দিনক্ষণ হবে। কুড়ুলখানা নিয়ে গাঁটটা চিরে ফেল।

দুখী আবার কুড়াল উঠাইল। কাল আসিয়া ফাঁড়িয়া দিবার কথা মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না। মেয়ের ভাগ্য যে ব্রাহ্মণ দেবতাদেরই হাতে। যেমন চান করতে পারেন। ভাল করে দেখে শুনে লগ্ন স্থির না করলে মেয়ের কপালে সুখ হবে না। কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া স্নেহার্দ্র হৃদয় পিতা, মৃত্যুর সঙ্গে যেন বাজী রাখিয়া কুড়াল চালাইতে লাগিল। পণ্ডিতজী নিকটে আসিয়া 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো' 'আউরভী জোরে হেঁইয়ো' বলিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

দুখীর যেন আর হুঁশ ছিল না। কোথা হইতে হঠাৎ শরীরে অসুরের বল সঞ্চারিত হইয়াছে। শ্রান্তি ক্লান্তি বিন্দুমাত্র নাই। যন্ত্রের মত কোপের পর কোপ মারিতে মারিতে হঠাৎ কখন গাঁট দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুড়াল হাত হইতে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, দুখীও হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। হাত পা একটু প্রসারিত হইল। বার দুই দুখী ভূমিতে গড়াইল, তারপর তাহার চক্ষুর তারকা কপালে উঠিয়া স্থির হইল। পণ্ডিতজীর এদিকে খেয়াল ছিল না। তিনি গাঁট খণ্ডিত হইতে দেখিয়া উল্লসিত চিত্তে বলিতেছিলেন—"বেড়ে জোয়ান, সাবাস। দেখতে লিকলিকে হলে হবে কি, গায়ে জোর আছে। এবার আর দু, এক হাত লাগিয়ে দে—ছোট ছোট চ্যালা হয়ে যাক।"

দুখী উঠিল না। পণ্ডিতজীর দয়া হইল। আহা বেচারী একটু গড়াইয়া আরাম করুক। তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া পণ্ডিত ঘাসীরাম শৌচে গেলেন, স্নান করিলেন ও একলোটা ভাঙ্‌ উদরস্থ করিলেন। তারপরে পণ্ডিতী পোষাক পরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দুখী তেমনই পড়িয়া আছে। জোরে হাঁক দিলেন—"ওরে ও দুখিয়া, কতক্ষণ আর ঘুমবি। উঠ, এবার তোরই ওখানে যাচ্ছি। চল, চল আর দেরী করিসনে।"

দুখী নড়েনা দেখিয়া এবার পণ্ডিতের কিছু ভয় হইল। নিকটে দেখেন দুখীর হাত পা কাঠের মত সটান হইয়া আছে। এবার ব্যাপার বুঝিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ডাকিলেন, "শুনছ, দুখিয়া তো মরে গেছে মনে হচ্ছে।"

ভয়ে পণ্ডিতানীর মুখ শুকাইল, চক্ষু কপালে উঠিল। বলিলেন, "এই তো একটু আগে কুড়ুলের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এর মধ্যে কি হয়ে গেল?"

কুড়ুল মারতে মারতেই মরে গেল। এখন উপায়? পণ্ডিতানী ততক্ষণে একটু সামলাইয়া লইয়াছেন।

—উপায় আবার কি! চামার পাড়া খবর দাও। লাশ উঠিয়ে নিয়ে যাক এসে।

বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে খবর ছড়াইয়া পড়িল। ঐ এক ঘর গোঁড় বাদ দিলে গ্রামে আর সবই ব্রাহ্মণ। লোক ঐ পথে আসাই ছাড়িয়া দিল। যে বাড়ীতে চামারের শব রহিয়াছে, তাহার দূষিত হাওয়া নাকে গেলেই জাত যায়। অথচ গ্রামের একমাত্র কূঁয়ার পথ এই দিক দিয়াই। জল না হইলে একদিনও চলিবে না। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী নাকে কাপড় গুঁজিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হাঁক লাগাইল—"দুখিয়ার লাশ সরাচ্ছ না যে? গাঁয়ের লোক কি আজ জল নিতে কূঁয়োয় আসবে না?"

এদিকে গোঁড় দুখিয়ার গ্রামে পৌঁছিয়া সব চামারকে সাবধান করিয়া দিল—"খবরদার, লাশ উঠাতে কেউ যাবে না! এখুনি পুলিস আসবে। ব্যাটা কশাই এক গরীবের প্রাণ নিয়েছে। হাতকড়ি পরে হাজতে গেলেই বামনাই বেরিয়ে যাবে। মড়া ছুঁলেই তোমাদের বিপদ বলে দিচ্ছি।"

গোঁড় চলিয়া যাইবার পরেই পণ্ডিতজী আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু চামারেরা কেহ অগ্রসর হইল না। শুধু দুখীর স্ত্রী কপালে করাঘাত

করিতে করিতে পণ্ডিতজীর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। তাহাদের সঙ্গে ক্রমে আরো দু'একজন চামরনী আসিয়া জুটিল। তাহাদের বুকফাটা কান্নায় বামুনপাড়ার আকাশ বাতাস শোকাকুল হইয়া উঠিল। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত হাহাকার কান্নাকাটি চলিল। ব্রাহ্মণ-দেবতাদের পক্ষে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু তবু লাশ উঠাইতে কোন চামার আসিল না। ব্রাহ্মণ মানুষ চামারের মৃতদেহ কি করিয়া স্পর্শ করিবেন? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?

পণ্ডিতানী অবিশ্রাম হাহাকার শুনিযা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিযাছিলেন। আপন মনে বকিতে লাগিলেন—"বলিহারি এদের গলা। সেই এক-নাগাড়ে সন্ধ্যে থেকে চেঁচিয়েই যাচ্ছে—তোদের বাপু এত দরদ কিসের? দু'দিন বাদেই তো আবার বিয়ে করবি। দু'চারবার হাঁক ডাক দিলি, বাস হয়ে গেল। তারপর ঘরে গিযে শো। তা না, গলাবাজী করেই যাচ্ছে; আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে।"

মড়া কান্নার মধ্যেই ঢুলিতে ঢুলিতে পণ্ডিতানী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভাতে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিলেন, ঝুরিয়া বা তাহার কন্যা কেহ নাই। দুখিযার লাশ সেখানেই পড়িয়া আছে। ঝুরিয়া একখানা ছেঁড়া কম্বল চাপাইয়া গিযাছে।

পণ্ডিতজী আর কি করেন। যদিও শাস্ত্রে লেখা নাই, তবু গোরু বাঁধিবার দড়ি বাহির করিলেন। লাশের পা দু'খানা দড়ি দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধিয়া টানিতে টানিতে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন। গো-ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিয়া স্নান করিয়া, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণের সেবাধিকার লাভ করিয়া, ব্রাহ্মণসেবায় জীবনপাত করিয়া, অন্তিমে ব্রাহ্মণ-দেবতার স্পর্শ পাইয়া দুখিয়া চামারের অক্ষয় সদগতি হইল সন্দেহ নাই।

পৌষের রাত

হল্কু আসিয়া স্ত্রীকে বলিল—সহনা এসেছে! যে টাকা তোর কাছে রেখেছিলুম এনে দে। ওর হাত থেকে তো বাঁচি।

মুন্নী ঝাঁট দিতেছিল। পিছন ফিরিয়া বলিল, "তিনটি তো মাত্র টাকা। ওকে দিয়ে দিলে কম্বল কিনবে কোত্থেকে? পৌষ মাসের রাতে ক্ষেত পাহারা দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা? শীতে জমে পাথর হয়ে যাবে যে। ওকে বলে দাও এখন নেই। ফসল কাটা হলে পর পাবে?"

হল্কু কিছুক্ষণ চিন্তিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শিয়রে শমনের মত পৌষ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কম্বল না হইলে দারুণ শীত কিছুতেই বাগ মানিবে না। কিন্তু জমিদারের পাইকই কি এমনি বাগ মানিবে? ধমক দিবে, গাল দিবে, শেষকালে হয়ত আদালতের পিয়াদা লইয়া হাজির হইবে। শীতের কথা পরে, আগে এই যমদূতের হাত হইতে তো নিস্তার পাই। ভাবিয়া-চিন্তিয়া হল্কু পুনরায় স্ত্রীর কাছে গিয়া অনুনয় করিতে লাগিল, "দিয়ে দে না যা আছে। কম্বলের জন্য অন্য ব্যবস্থা হবে।"

মুন্নী একটু দূরে সরিয়া গিয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, "তা হলেই হয়েছে। একটু শুনতে পারি, কি ব্যবস্থা করে রেখেছ। দান খয়রাতের আশায় আছ নাকি? এখানে ওখানে এত ধারকর্জ্জ হয়েছে যে, এখন কোথাও হাত পাতলে পাবে সে আশা আর নেই। কতদিন থেকে বলছি চাষবাস ছেড়ে দাও। বছর ভোর দিনরাত খেটে খেটে দু'চার মণ ঘরে আসতে না আসতেই পাওনাদার ছেঁকে ধরে। জমিদারের বকেয়া, সুদের ওপর সুদ, দোকানদারের বাকী সব মিটিয়ে দু'চার দানাও বাঁচে না। উপোষের কপাল আর এজন্মে ঘুচল না। তার চেয়ে দিন মজুরী ভাল। নিত আনি নিত খাই, বাকী বকেয়ার ধার

ধারিনে। অমনি ক্ষেতির মুখে আগুন। যাও যাও, টাকা পাবে না।"

হল্কুর যদিও ফুঁযে উড়িবার মত হাল্কা শরীর নয়, তবু স্ত্রীর কথায় দমিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "তবে আমাকে গাল খাওয়ানোই তোর ইচ্ছে।"

মুন্নী গরম হইয়া বলিল, "কেন গাল দেবে? মগের মুল্লুক নাকি?"

বলিয়াই এমন ভাব ধরিল যেন স্বয়ম্ একবার বোঝাপড়া করিয়া লইবে। কিন্তু পাওনাদারের, জমিদারের পাইক পেয়াদার রকম-সকম সে জানে। ভালোমানুষ স্বামীটির মত তাহারা ধমকে টলিবে না। সে একটু ইতস্ততঃ করিল, দু'ফোটা চোখের জল ফেলিল; শেষকালে কুলুঙ্গী হইতে নেকড়ায় বাঁধা টাকা তিনটি আনিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে স্বামীর হাতে দিল। হল্কু টাকা দিয়া ফিরিয়া দেখিল মুন্নী পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে গালি পাড়িতেছে। হল্কুরও কান্না পাইতেছিল। এক এক পয়সা করিয়া জমাইয়া, আট নয় মাসে তিনটি মাত্র টাকা হইয়াছিল। তাহাও গেল। সামনে দুর্জ্জয় শীত। এবারও শুধু একখানা চাদর ও কয়েক ছিলিম তামাক সম্বল করিয়া রাতে ক্ষেত পাহারা দিতে হইবে। কিন্তু আর যেন সহে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের তেজ কমিয়া আসিতেছে; শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া সামান্য সুতী চাদরে আর কিছুতেই কুলায় না।

পৌষের প্রখর রাত্রি! মানুষের কথা কি, শীতের প্রতাপে আকাশের তারাগুলি পর্য্যন্ত থরহরি কাঁপিতেছে। হল্কু ক্ষেত পাহারা দিতেছে—যেমন প্রতি বৎসর দেয়। নহিলে নীল গাইয়ের পাল আসিয়া এক রাত্রির মধ্যেই সব উজাড় করিয়া দিবে। ক্ষেতের এককোণে পাতা দিয়া তৈরী এক ছাতা বাঁশের হাতলের উপর বসানো। তাহারই নীচে

বাঁশের তৈরী খাটিয়া ! তাহার উপর হল্কু আপনার মলিন ছিন্ন চাদরখানা গায়ে দিয়া আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। নিদ্রা আসিবে সে ভয় নাই। এমন তীব্র শীত যে, সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুতের কশা হানিয়া চেতনাকে সদা কম্পমান করিয়া রাখে। খাটের নীচে হল্কুর কুকুর জব্বরেরও সেই দশা। বেচারী এখন বার্দ্ধক্যের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গায়ের লোম পাতলা হইয়া গিযাছে। সুতরাং শীতের আক্রমণে সেও কম কাহিল নয়। তার উপর, অনশর অর্দ্ধাশনে সে প্রভুর সমভাগী। গ্রামে বাহির হইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করিয়া পেট ভরাইবে সে বয়স নাই ; প্রভু পরিবর্ত্তনও এখন সম্ভব নয়। হাড় বাহির করা কুকুরকে কে আদর করিয়া আশ্রয় দিবে ? সুতরাং জব্বর কুণ্ডলী পাকাইয়া, পেটের গহ্বরে মুখ পুরিয়া দিযা, খাটিয়ার নীচে পরিয়া আছে ; মাঝে মাঝে কুঁকুঁ করিযা শীত ও অনশন-জর্জ্জর প্রাণের কাতরতা ব্যক্ত করিতেছে। নিদ্রার সুখ প্রভু ভৃত্য কাহারও ভাগ্যে নাই।

হল্কু এতক্ষণ সটান শুইয়াছিল। এখন হাঁটু দুইটি গলার কাছে টানিয়া আনিযা জব্বরের মতই কুণ্ডলী পাকাইল। তারপর খাটিয়ার ছিদ্র পথে নিচের দিকে চাহিল। জব্বর মাঝে মাঝে কুঁকুঁ করিতেছে, তারপর কুণ্ডলীকে আরো ছোট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হল্কু বলিল, "খুব শীত না রে জবরা ? তখন বল্লুম ঘরে খড়ের উপর শুয়ে থাক্, সে কথা তো শুনলিনে। কেন যে সব জয়গায় আমার আগে আগে চলে আসিস। এখন মর শীতে কেঁপে।"

জবরা শুইয়া শুইয়াই কুণ্ডলীর পার্শ্বস্থ লেজ যৎসামান্য নাড়িয়া দিল কুঁকুঁকে দীর্ঘতর করিল, একবার হাই তুলিল এবং প্রভুর সস্নেহ অনুযোগের জবাব হইয়াছে মনে করিয়া তারপর চুপ করিল।

হল্কু নিচের দিকে হাত গলাইয়া দিয়া জব্বরের পেটে হাত বুলাইল

আর বলিতে লাগিল, "কাল থেকে আর আসিসনে, খবরদার! নইলে আর ফিরে যেতে হবে না; শীতে জমে যাবি। বাপরে বাপ, কি শীত!"

বলিয়া হল্কু উঠিল, এক চিলিম তামাক সাজিল। আট চিলিম ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। বলিতে গেলে, শীতের বিরুদ্ধে এই তো এক সম্বল। চিলিমে দম দিতে দিতে হল্কু ভাবিতে লাগিল: ক্ষেত করার এই তো সুখ। তাও যদি পেট ভরে খেতে পেতাম। সবই বোধহয় ভাগ্যের খেলা। আমার গাঁয়েই কতলোক আছে, শীত যাদের কাছে গিয়ে গরমের ভয়ে পালিয়ে আসে। লেপ তোষক কম্বল কত কী আয়োজন। আর আমি? কী কপাল করেই এসেছিলাম!

ততক্ষণে জব্বরও উঠিযা, খাটিয়ার নিচ হইতে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে। হল্কু বলিল, "কি রে খাবি নাকি এক টান? এতে শীত যে তেমন কমে তা নয়, তবে হ্যাঁ মনকে আঁখি ঠারা বটে। আচ্ছা, কাল তোর জন্যে বাড়ী থেকে খড় নিয়ে আসব। আজ রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দে বাবা।"

জব্বর এবার হল্কুর পাশে আসিয়া গা ঘেসিয়া বসিল। যতক্ষণ না হল্কুর তামাক খাওয়া শেষ হইল, ততক্ষণ এইভাবেই বসিয়া রহিল। চিলিম রাখিয়া দিয়া হল্কু আবার খাটিয়া আশ্রয় করিল। এবার সে ঘুমাইবেই। শরীরে যে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা উবিয়া যাইবার আগেই ঘুম আসা চাই।

কিন্তু চিলিমের প্রভাব যেন চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইল। একটু পাশ ফিরিতে না ফিরিতেই আবার সেই ঠক্‌ঠক কাঁপুনি। শীত যেন নাম না জানা এক দৈত্যের মত বুকে চাপিয়া বসিয়াছে, নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট হয়।

কোন মতেই যখন ঘুম আসিল না, তখন হল্কু আবার উঠিল,

জব্বরকে আস্তে আস্তে খাটিয়ার উপর তুলিয়া নিজের বুকের কাছে শোয়াইল। সাবান-মাখা কুকুর তো নয় ; সুতরাং ইহজন্মে স্নান না করার ফলে যে পরিমাণ দুর্গন্ধ তাহার গায়ে পুঞ্জীভূত হইয়াছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক চাপ হল্কুর নাকের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। কিন্তু জব্বরের দেহ হইতে সামান্য উত্তাপও হল্কুর দেহে সঞ্চারিত হইতেছিল। সেই একবিন্দু আরামের লোভে হল্কু দুর্গন্ধকে গ্রাহ্য করিল না।

আর জব্বর ? সে তো আহ্লাদে আটখানা হইয়া কি যে করিবে, কি করিলে মানবের আত্মীয়তার প্রতিদানে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে, যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। একবার গা চাটে, পরক্ষণে প্রবলবেগে লেজ আন্দোলন করে, তারপরে উৎসাহের প্রবল তোড়ে খাটিয়া হইতে লাফাইয়া কাল্পনিক শত্রুর অভিমুখে সবেগে সশব্দে ধাবমান হয়, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চেঁচামেচি করিয়া খাটিয়ায় আরোহণ করে! কিছুক্ষণ এইভাবে চলিল, তারপরে যেন শ্রান্ত হইয়াই হল্কুর গা ঘেঁসিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া রহিল।

একঘণ্টা চুপচাপ কাটিল। রাত্রি প্রায় চারিটা। ঘুম আসিবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। দুই প্রাণী জীবন্মৃতবৎ পাশাপাশি পড়িয়া আছে। এখন একটু একটু হাওয়া দিতে লাগিল,. সঙ্গে সঙ্গে শীত দেহের নিভৃততম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহকে যেন থামাইয়া দিবার উপক্রম করিল। আর তো কোনমতেই পড়িয়া থাকা যায় না। হল্কু উঠিয়া বসিল বুকে হাঁটু দুইটি লাগাইয়া তাহার মধ্যে মাথা গুঁজিল। কিন্তু অবস্থান পরিবর্তনে অবস্থা বদলায় না। পলকের মধ্যে যেই সেই। মনে হইতে লাগিল, রক্তস্রোত বুঝি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তরল প্রাণধারা

দইয়ের মত জমিয়া ধমনীতে থমকিয়া দাঁড়াইযাছে। হা ঈশ্বর, আজকের কালরাত্রি কি কাটিবে না! শীত-সমাধিই বুঝি ভাগ্যে আছে। হল্কু দাঁড়াইয়া পড়িল, ছাতার বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রাত কত বাকী ঠাহর করিতে লাগিল। সপ্তর্ষি এখনও অর্দ্ধপথও অতিক্রম করে নাই, মধ্যগগনে পৌঁছিতে পৌছিতে একপ্রহর এখনও লাগিবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা হল্কু আবার তামাক সাজিতে বসিল। ঘুঁটে ধরাইবার সময় অকস্মাৎ কি মনে পড়িতেই চমকাইয়া উঠিল। এতক্ষণ এই সামান্য কথাটি তাহার কেন স্মরণ হয় নাই, তাহা হইলে কি এমন দুর্ভোগ কপালে ঘটিত। হল্কু তামাক সাজা রাখিয়া দ্রুতপদে ক্ষেত পার হইল, রাস্তার পাশের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া রাশি রাশি শুকনো পাতা চাদরে বাঁধিযা লইয়া আসিল। যথেষ্ট হইবে না মনে করিয়া আবার গেল, আবার এক বোঝা লইয়া ফিরিল। তারপরে তামাক সাজিয়া ক্ষেত হইতে রশিটাক দূরে ধুনী জালিযা আরাম করিয়া বসিল; দশ পাঁচটি করিয়া পাতা আহুতি দিতে দিতে "জঠরেণ হুতাশন" সেবন করিতে লাগিল। ধমনীর শোণিত-প্রবাহে আবার ধীরে ধীরে জীবন-চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইল।

পাতা জ্বালাইতে জ্বালাইতে স্মরণ হইল, পাশেই অড়হরের ক্ষেতের কথা। হল্কু আবার উঠিয়া গেল, গোটা দশ বারো গাছ উপড়াইয়া লইযা আসিল।

জব্বরের ভাগ্যও খুলিয়া গিয়াছে। পাতা সংগ্রহ কালে সে একস্থানে দুইটি হাড় আবিষ্কার করিয়াছিল। জব্বর পুলকিতচিত্তে তাহাই মুখে করিয়া লইয়া আসিয়াছে ও পরম পরিতৃপ্তিভরে, আগুনের পাশে বসিয়া তাহাই চিবাইয়া খাইতেছে। মাঝে মাঝে হাড় মাটিতে রাখে, বার কয়েক কুঁকুঁ করে, আবার অস্থিতে মন সন্নিবেশ করে। এবারকার কুঁকুঁতে শীতার্ত্তের কাতরধ্বনি নয়, বেশ আরামের আমেজ পাওয়া যাইতেছে।

হাওয়া আগের চেয়ে সামান্য জোরে বহিতেছে কিন্তু বরফের ছুরীর মত বিঁধিতেছে না। বরং অগ্নিতাপে সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠায়, হল্কু এখন রাত্রি শেষের ধীর-সমীরণ-বাহিত মেহ্‌দীফুলের সুগন্ধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। চিলিম নামাইয়া রাখিয়া ক্ষণকাল সে মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া হাওয়া হইতে গন্ধ শুঁকিতে লাগিল। কি মৃদু-মধুর সুবাস। খালি পায়ে শিশির-সিক্ত ঘাসের উপর দিয়া যাতায়াত করাতে, তাহার পা দুখানি যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল; উত্তাপ-সান্নিধ্য হেতু ধীরে ধীরে তাহাতে জীবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ঝিন ঝিন করিয়া এক সুচ ফোটানো অনুভূতি হইতেছে, কিন্তু ফুলের মদির সুবাসে, তাহা যেন গায়েই লাগিতেছে না।

—কিরে জবরা, এখন তো শীত কচ্ছে না?

জব্বর মিঞার চিরকাল যদিও একই ভাষা—সেই সনাতন আদি ও অকৃত্রিম কুঁকুঁ, তাহার রকম ফের আছে, গমক ঠমক, দীর্ঘ হ্রস্ব, উঁচু নীচু পর্দা আছে। তার উপর আনুসঙ্গিক পোঁ ধরিবার পক্ষে লেজখানাও কম কার্য্যকরী নয়। সে সকল অস্ত্র একসঙ্গে প্রয়োগ করিয়া প্রবলবেগে প্রতিপন্ন করিল,—শীত? সে বেটা আবার কে? নাম শুনিনি তো?

অবশ্য একটা সূক্ষ্ম অর্থবোধ হল্কুর মত ছিল না সে মোটের উপর বুঝিল জব্বর আর শীতে কাবু নহে, সে এবার যেন আপন মনে বলিয়া উঠিল, "চাষার বুদ্ধি কি না: এতক্ষণ একথাটাই মনেই হয়নি। নইলে এই দুর্ভোগ?...আচ্ছা জবরা, লাফ দিয়ে ধুনী পার হতে পারিস?"

এই বলিয়া হল্কু অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিল বোধহয় মানবিক ভাষায় জব্বরের দখল সম্বন্ধে সংশয় থাকাতেই ইঙ্গিতের সহায়তা লইতে হইল। জব্বর গম্ভীর নেত্রে, দীর্ঘ মুখখানা আর একটু দীর্ঘ করিয়া অগ্নিরাশির পরিমাপ করিল, তারপর মিটমিট করিয়া

বারকয়েক হল্কুর পানে চাহিল। তাহার অর্থ কি এই কাল মুন্নী বিবির কাছে তো কথাটা ফাঁস করিবে না, নইলে অনেক দুর্গতি কপালে লেখা আছে! অন্তত, হল্কু সেই রকম বুঝিল। বলিল, "না না বলবো না, ভয় নেই একবার তুই লাফ তো দে। দেখি গায়ে কি রকম জোর আছে"—বলিয়া হল্কু আর একবার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিল। জবরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গেল, এবং ঠিক উপর দিয়া না হইলেও, একলাফে ধুনী পার হইল। হল্কু চেঁচাইয়া উঠিল, "সাবাস বাহাদুর!" জব্বর ওপাশ হইতে আর লাফ দিল না। পেটে আগুনের আঁচ লাগিয়াছিল, কিছু লোম পুড়িয়া গিয়াছিল। আস্তে আস্তে ধুনী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভুর পাশে আসিয়া বসিল।

পাতা সব জ্বলিয়া গিয়াছে, অড়হরের গাছগুলিও। রাত্রি এখনও ঘণ্টা দুই বাকী। পাশের জঙ্গলে এখনও ঘোর অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলি যেন মাথার সাহায্যে অন্ধকারের আকাশবিলম্বিত পর্দ্দাখানাকে টাঙ্গাইয়া রাখিযাছে। হাওয়ার আন্দোলনে সেই পর্দ্দা সামান্য হেলে-দুলে; এদিকে আবার নির্ব্বাপিত অঙ্গারস্তূপে শিখা জাগিয়া উঠে; আবার অন্ধকার-সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত লোহিতবর্ণ তরণীর মত ক্ষণকাল কাঁপিতে থাকে।

হল্কু চাদরখানা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। এবার তাহার সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া অগ্নিগর্ভ ভস্মরাশির পাশে শুইয়া পড়িল এবং চাদরের ভিতরেই গুণগুণ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির জাগরণে ক্লান্ত চোখ দু'টি আলস্যে জড়াইয়া আসে, সুখস্পর্শ মৃদু উত্তাপ মাতৃ-স্নেহের মত দেহে হাত বুলাইয়া ফিরে। কিন্তু ঘুমাইলে তো চলিবে না। রাত্রির শেষপ্রহরই যে নীলগাইদের চরিবার বিশিষ্ট সময়। ক্ষেত হইতে

সে বেশ একটু দূরের আছে, ইহা চিন্তার কথা। কিন্তু জব্বরসিং থাকিতে বিশেষ ভাবনাও নাই। (হল্কু কুকুরের এমন নাম রাখিয়াছে, যাহাতে ইচ্ছামত যে কোন উপাধি যোগ করার বাধা নাই, বেশ মানাইয়া যায়।) জব্বর নবলব্ধ শক্তির বেশ ভালই ব্যবহার করিতেছে। তবে সে যেভাবে এখন একনাগাড়ে চেঁচাইয়া যাইতেছে, তাহাতে বোঝা কঠিন, কোন জানোয়ার আসিয়াছে কিনা, অথবা ইহা তাহার অতিরিক্ত স্ফূর্তিসঞ্জাত। একবার জবরা ভীম পরাক্রমে ধাওয়া করাতে হল্কু উঠিয়া বসিল। নাঃ, কোন জানোয়ারের সাড়া শব্দ নাই। জবরা থাকিতে জানোয়ার আসিবে সাধ্য কি! আবার হল্কু শুইয়া পড়িল। নিজেকে সজাগ রাখিবার উপায়স্বরূপ এবার নূতন এক রাগিণী ভাঁজিতে লাগিল।

কিন্তু রাগিণীর জোর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল। জব্বরের দিগ্বিদিকমন্থনকারী প্রবল ঘেউ ঘেউ শব্দ দূরাগত ক্ষীণ কলকোলাহলের মত ভাসিয়া আসিতেছে, লুপ্তাবশেষ চেতনায় তাহা আর রূঢ় আঘাত করে না; ববং ঘুমপাড়ানি গানের মত নেশা ধরায়। হল্কু জাগরণের বিভিন্ন দেউড়ী পার হইয়া শেষে সুপ্তিসাগরে তলাইয়া গেল।

যখন জাগিল, তখন রোদ উঠিয়াছে: শিশিরস্নাত পত্রপুষ্প তৃণলতা আলোতে যেন মুক্তা বিন্দু পরিয়া ঝলমল করিতেছে। চোখ কচলাইতে কচলাইতে হল্কু ক্ষেতের দিকে চলিল! হঠাৎ তাহার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইবার উপক্রম। সমস্ত ক্ষেত একেবারে চাঁচাছোলা পরিষ্কার। একটি পাতাও কোনখানে অবশিষ্ট নাই। জব্বর যথাসাধ্য কোলাহল করিয়াছে কিন্তু মানুষের কণ্ঠ কুকুরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিত না হওয়ায় নীল গাইয়ের দল নিশ্চিত মনে ক্ষেতখানা চষিয়া গিয়াছে।

বিস্ময়ের বেদনার প্রথম আঘাত সামলাইলে পর, হল্কু যেন একটু

আরাম বোধ করিল। যাক্, আর আকাশের নীচে হিম খাইতে হইবে না, সেদিক দিয়া নীল গাইয়েরা নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়া হিতৈষীর কাজই করিয়াছে। ক্ষেত করার পাট আর নয়, দিন মজুরীই সই। পৌষের রাত্রে ঘুমাইতে তো পারিবে। হোক না খড়ের ঘর, খড়ের বিছানা। শীতের দারুণ প্রহারের হাত হইতে এতদিনে অব্যাহতি মিলিল।

সৎকার

নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। জীবন-মুখর গ্রামখানি যেন অন্ধকারের অতলে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেছে। কুঁড়েঘরের সামনে পিতাপুত্র মুখোমুখি বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল। খড়কুটা লতাপাতার আগুন কতক্ষণ থাকে। পাতা ফুরাইয়া আসিল, আগুনও নিভিয়া গেল। আবার সেই হাড়-কাঁপানো শীত। কিন্তু শীতের কাঁপুনি অপেক্ষা অধিক মর্ম্মভেদী, বুধিয়ার কাতরাণি! প্রসব-বেদনায় বুধিয়া ভিতরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে। এক-একবার এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে শ্রোতা দুইজনের হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া যায়।

ঘীসু বলিল, "মনে হচ্ছে বাঁচবে না। কালও সারাদিন বেচারী আমাদেরই জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছে। যা যা, একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আয়, মধুয়া।"

মাধব দাঁতমুখ খিচাইয়া জবাব দিল, "মরবি তো তাড়াতাড়ি মর! চেঁচামেচির হাট বসিয়েছে! দেখে করব কি?"

ঘীসু, "তুই দেখছি একেবারে জানোয়ারের অধম হয়ে গেছিস, পাষণ্ড কোথাকার! পুরো একটি বছর মেহনত-মজুরী করে তোর পিণ্ডি

জুটিয়েছে বেচারী—এখন চোখের দেখা দেখতেও নবাব-পুত্তুরের কষ্ট হচ্ছে। একেবারে ডাহা নিমকহারাম!"

মাধব কাতর হইয়া বলিল, "ওর ছটফটানি চোখে দেখতে পারিনে বাবা! এর চেয়ে যে মরে গেলে শান্তি।"

জাতিতে চামার। সমস্ত গ্রামে ইহাদের বদনাম। মাধব এমন কাজচোর যে আধঘণ্টা কোথাও যদি খাটে তো তারপর একঘণ্টা ঠায় বসিয়া তামাক টানিতে থাকে। গ্রামের কাজের অভাব নাই কিন্তু এমন জন্ম-কুড়েকে কাজ দেবে কে? আর কাজের জন্য ইহারও যে বিশেষ চেষ্টা আছে তাহা বলা যায় না। কেহ কোথাও যদি কোন কারণে অন্য মজুর না পাইয়া দায়ে পড়িয়া মাধবকে একদিন কাজে লাগাইত, তারপর তিনদিন কেহ তাহাকে ঘর হইতে নড়াইতে পারিত না। দু'একদিন উপবাস করিলে তবে টনক নড়িত। ঘীসু এদিক-ওদিক হইতে একবোঝা কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত; মাধব বাজারে লইয়া গিয়া বেচিয়া আসিত। তারপর আবার বাপ-বেটা হাত-পা গুটাইয়া, ঠায় বসিয়া থাকিত। ধৈর্য্যে উভয়ে একবারে যেন পরমহংস হইয়া জন্মিয়াছে; বহুজন্ম সাধনা না করিলে এমন নিশ্চল নির্লিপ্ত ভাব জন্মায় না। ঘরে দু'চারটি মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ছাড়া কোন বাসন-বর্ত্তন নাই। পরনে শতছিন্ন মলিন গিঁট দেওয়া কাপড়। কাকুতি-মিনতি করিয়া গ্রামের সকলের কাছ হইতেই সুবিধা মত দু, চার টাকা কর্জ্জ লইয়াছে। উত্তমর্ণগণকে হস্ত ও বচন প্রহারে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহজন্মে ইহাদের চিৎহস্ত আর উপুড় হইবার সম্ভাবনা নাই। গাল খাইয়া, মার খাইয়া ইহাদের মনে কোন বিকার উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। মুখে রা নাই, চোখ-মুখে দীনতা ঝরিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বদাই জোড় হস্ত। দেখিয়া লোকদের দয়া হইত। প্রাপ্তির আশা না থাকিলেও

কাল-ভেদে দু'চার পয়সা উহাদের দিত। গ্রামের কৃষকদের মটর, আলু প্রভৃতির চাষ হইলে ইহারা ফসলের সময় না বলিযাই কিছু কিছু উঠাইয়া আনিত—কখন আখ ভাঙ্গিয়া আনিয়া তপ্তমুখে চিবাইতে থাকিত। ফসলের সময় এইভাবে পাঁচ সাত দশদিন মহানন্দে কাটিয়া যায়। কিন্তু ফসল তো সারা বৎসর ক্ষেতে লাগিয়া থাকে না। তখন আবার একটু-আধটু চেষ্টা-চরিত্র না করিলে অনাহারে মারা পড়িতে হয়। সুতরাং কষ্টে-সৃষ্টে মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়িতে হয় বই কি।

ঘীসুর এইরকম উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই ষাট বৎসর পার হইযাছে, সুপুত্র মাধব বাপের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে আরও এককাঠি উপরে পৌঁছাইয়া বাপের নাম আরও বেশী উজ্জ্বল করিতেছে। এই মুহূর্ত্তে বাপবেটা দু'জনে আগুন পোহাইতেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে না-বলিয়া-আনা আলু পোড়াইতেছিল। মাধবের মার দেহান্ত অনেক কাল হইযাছে। গত বৎসর বিবাহ করিয়া সে বউ আনিয়াছে। বউ ঘরে পা দিয়াই চালচুলাহীন গৃহস্থালীতে কিঞ্চিৎ সুব্যবস্থা আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রতিবেশীর গম পিষিযা, ঘাস কাটিযা, বাসন মাজিয়া বুধিয়া দিনান্তে সের খানেক আটা-সংগ্রহ করিয়া আনিত। আর নিত্য পরমনিষ্কর্ম্মা স্বামী-শ্বশুরের শূন্য উদরে পিণ্ড যোগাইত। বুধিয়ার অভ্যুদয়কাল হইতে তাহারা আরও বেশী কুঁড়ে হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মেজাজের পারাও দু'এক ডিগ্রী চড়িয়া গেল। দায়ে ঠেকিয়া কেহ কাজের জন্য ডাকিতে আসিলে দ্বিগুণ মজুরী হাঁকিয়া বসে।···

সেই অন্নদায়িনী উদয়াস্ত পরিশ্রমশীলা বুধিয়া এখন প্রসব-বেদনায় মরণোন্মুখ। ঘরের বাহিরে পিতা-পুত্রে বসিয়া বচসা করিতেছে। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হয় বুধিয়ার যন্ত্রণা অপেক্ষা তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাতই অধিক কষ্টদায়ক হইতেছে! এস্পার উস্পার একটা কিছু

হইয়া গেলে আরামে ঘুমানো যায়।

ঘীসু ছাইয়ের নিচু হইতে আলু বাহির করিতে করিতে বলিল, "ভেতরে গিয়ে একটু দেখেই আয় না, বাপু। কোন অপদেবতা ভর করছে বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা গেরো! ওঝা ডাকালেই তো এক-টাকা চেয়ে বসবে।" বলিয়া মুখ বিকৃত করিল।

মাধবের আশঙ্কা—কুঁড়ের মধ্যে গেলেই বাবা আলুর বেশী ভাগ অমনি উদরে চালান করিবে। জবাব দিল, "আমার তো ওখানে যেতে ভয় করে।"

—ভয় কিসের? আমি তো এখানে রয়েছি।

—তুমি নিজেই যাও না কেন?

—তোর মা যখন মারা গেল, তিনদিন আমি তার পাশ থেকে নড়িনি! আর তোর এই ব্যাভার। আমি যে যাব, আমাকে দেখে লজ্জা পাবে, কি, পাবে না? আজ পর্য্যন্ত যার মুখ দেখলুম না, এখন তার এ অবস্থায় যাই কি করে? তবু যা হোক হাত-পা ছুঁড়ে যে আরামটুকু পাচ্ছে, আমাকে দেখলে তাও আর পাবে না।

—আমি ভাবছি ছেলেপিলে কিছু যদি হয়ে থাকে, তবে তো আবার নতুন ফ্যাসাদে পড়তে হবে। শুঁট চাই, গুড় চাই, তেল চাই। ঘরে তো যাকে বলে লবডঙ্কা—ঠনঠন হাঁড়ির অবস্থা।

—ভাবিসনি মেধো, সব এসে পড়বে। ভগবান দেবে। যারা আজ এক পয়সা দিচ্ছে না, তারা কাল ডেকে যেচে টাকা দেবে। আমার ন' ন'টি ছেলে হয়েছে। ঘরে চিরকালই এমনি হাঁড়ি ফাটতো কিন্তু প্রতিবারই ঐ উপরিওয়ালা কোন না কোন উপায়ে দায় উদ্ধার করেছে।

যে সমাজ-ব্যবস্থায় রাত্রিদিন পরিশ্রমকারীর অবস্থাও মাধব-ঘীসুর

দৈন্যদশা হইতে খুব বেশী ভাল নয়, যেখানে চতুর ফাঁকিবাজ গাঁতিদার কৃষকের পরিশ্রমলব্ধ ধনের বার আনা বিনা মেহনতে আত্মসাৎ করিয়া লয়, সেখানে এই নিরুপায় অদৃষ্টনির্ভরতা যে নিরাশ লোকের মনে আধিপত্য করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। ঘীসু বরং ভালই আছে, পরিশ্রমও করে না, বঞ্চিতও হয় না। কিছুমাত্র না খাটিয়া যাহারা পরস্ব ভোগ করে সে তাহাদেরই একজন। তবে পার্থক্য এই যে বুদ্ধি বিদ্যা গায়ের জোর নাই; চালাক চতুর নহে; তাই মাথা উঁচু করিয়া চুরি করিতে পারে না। তাই, পরগাছাদের মধ্যে সে দীনতম। যেখানে তাহার সমধর্ম্মীরা গ্রামের মুখিয়া, জমিদার পত্তনিদার হইয়া আছে, সেখানে সে উপহাস ও করুণার পাত্র। তবু ভাল যে প্রাণান্ত পরিশ্রম তো করিতে হয় না, কেহ তাহার পরিশ্রম-ফল কাড়িয়াও লইতে পারে না। সেই সান্ত্বনা।

আলু বাহির করিয়া ছাই ছাড়াইয়া উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইল। বুধিয়া সকাল হইতে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। পিতাপুত্রের পিণ্ড ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ক্ষুধার তাড়না এখন যে বিলম্ব সহে না। গরম আলু চিবাইতে গিয়া জিহ্বা জ্বলিয়া গেল। খোসা ছাড়াইলে আলুর বাহিরের দিকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসে কিন্তু ভিতরে তখনও খুব গরম। তাড়াতাড়ি মুখে পুরিলে মুখের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। সুতরাং উভয়ে আলু মুখে পুরিয়াই না চিবাইয়া গিলিতে লাগিল। একবার জঠরে পৌঁছিয়া গেলেই হয়—সেই অগ্নিসমান তপ্ত বস্তুকেও ক্ষণমাত্র ঠাণ্ডা করিবার কলকব্জার অভাব নাই। গোটা গোটা আলু গিলিতে গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

ধারা-চিহ্নিত মুখে আলু গিলিতে গিলিতে ঘীসুর বিশ বৎসরের আগের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঠাকুরদের বাড়ীর বিবাহে কি

খাওয়ানটাই খাওয়াইয়াছিল! বলিল, "সেবারকার কথা সারা জীবনে ভুলিনি! এর পর আর ভরপেট খাওয়াই কোথাও জুটল না। কন্যা-পক্ষেরা সকলকে পেট ভরে হালুয়া পুরী খাওয়ালে। কেউ বাদ যায়নি। ছোটবড় সকলে পুরী, কচুরী খেল, আর সে-সব একেবারে খাঁটি ঘিয়ের। চাটনী, রায়তা, চার রকমের তরকারী, দই, মিঠাই আরো এমনি কত! ঢালা হুকুম—যত পার খাও। যা চাও পাবে। সকলে যা খেলে, তার আর কি বলব। কেউ আর জল খায় না, পাছে পেটে জায়গা জুড়ে যায়। পরিবেশনকারীরা কেবল দিয়েই যাচ্ছে, মানা করলেও শোনে না। খাওয়ার পর আবার পান এলাচীও দিলে। কিন্তু পান খাবে কে! গলা পর্য্যন্ত এসে ঠেকেছে, দাঁড়াতে পারছিনে। বাড়ী এসেই শুয়ে পড়লুম। এমন আরামের ঘুম এলো যে কি বলব। এখন আধপেটা খেয়ে শুই ; ক্ষিধেয় ঘুম ভেঙ্গে যায়।"

মাধব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে জিভ চাটিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল, "এখন আর কি তেমন লোক আছে যে খাওয়াবে।"

ঘীসু উদাসস্বরে জবাব দিল, "সেই যুগ কি আর আছে বাবা। সে সব সোনার মানুষ আর হয় না। এখন সব ব্যাটাদের টাকা জমাবার নেশায় ধরেছে। হাড়কেপ্পন সব, এক পয়সা ফালতু খরচ করবে না। 'কিরিয়া করম' পালপার্ব্বণ সব উঠেই গেল।"

—তুমি বোধহয় কুড়িখানেক পুরী উড়িয়েছিলে?

—বলিশ কি মেধো? মোটে কুড়িখানা? অনেক বেশী।

অনেকের উপর 'বেশ একটু' মুখটান দিয়া আধিক্য বুঝাইতে হইল।

—আমি পঞ্চাশখানা খেয়ে তবে উঠতাম।

—তুই কি ভাবছিস আমি কম খেয়েছিলাম? জোয়ান বয়সে আমি দেহে তোর দু'গুনো ছিলাম। তুই আমার সমান কি খাবি মেধো!

আমার অর্দ্ধেক শরীরও নয় তোর।

আলু খাইয়া দু'জনে সেই নির্ব্বাপিত-প্রায় ধুনির পাশে ময়লা। কাপড়ের একাংশ পাতিয়া শুইয়া পড়িল। বুধিয়ার কাতরানি তখন একটু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। বাপ-বেটার এবার আরামে ঘুমাইয়া পড়িবার বাধা নাই।

সকালে উঠিতে একটু বেলা হইয়া গেল। মাধব ভিতরে গিয়া দেখিল, বুধিয়ার শরীর ঠাণ্ডা। মুখে মাছি ভনভন করিতেছে। চোখ কপালে। সারা শরীর ধূলায় আচ্ছন্ন। ছট্‌ফট্ করিতে করিতে অনবরত মাটিতে গড়াইয়াছে,—মাটিতে তাহারই চিহ্ন। প্রসব হয় নাই। ছেলে পেটেই মরিয়া গিয়াছে।

মাধব দৌড়িয়া ঘীসুর নিকট আসিল। দু'জনে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে নিয়মমাফিক শোক প্রচারের জন্য মড়া-কান্না জুড়িয়া দিল। প্রতিবেশীরা একে একে জুটিতে লাগিল এবং প্রাচীন প্রথানুসারে শোকে সান্ত্বনা দিতে সুরু করিল।

বিনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিবার জুতসই ফুর্সৎ নাই। এখনি শবের আচ্ছাদন-বস্ত্র ও সৎকারের জন্য কাঠ যোগাড করিতে হইবে। বলা-বাহুল্য ঘরে এক কাণাকড়িও নাই।

পিতাপুত্র হায়-হায় করিতে করিতে গ্রামের জমিদারের নিকট পৌঁছিল। জমিদার ইহাদিগকে দু'চোখে দেখিতে পারিতেন না। জমিদার কেন, ইহারা অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। ছিঁচকে চুরির অপরাধে, কথা দিয়া ও আগাম লইয়া মজুরি করিতে না আসার অপরাধে, জমিদারের হাতে উভয়ে একাধিকবার প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। চেঁচামেচিতে বিরক্ত হইয়া জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন—"হল কি

তোদের ? দু'বছর পরে এলেন তো বাড়ী মাথায় করে তুলেছেন ? আমি তো ভাবছিলাম, তোরা আর এখানে নেই, আপদ গেছে !"

ঘীসু ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া স্বভাবসিদ্ধ দীনতার সঙ্গে বলিল, "সরকার, বড় বিপদে পড়ে এসেছি। মাধবের বৌটা কাল রাতে মারা গেল। রাতভর ছট্‌ফট্‌ করছিল, হুজুর। আমরা বাপবেটা দু'জন রাত-ভোর দু'চোখের পাতা এক করিনি। ঠায় জেগে বসেছিলাম ওর পাশে। ওষুধ-পত্তর যা পেরেছি করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, মালিক। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, ঘর উজাড় হয়ে গেল। এখন কাঠ চাই, কাপড় চাই। আমাদের যা কিছু ছিল, চিকিচ্ছে করাতে সব গেছে হুজুর। এখন আপনি দয়া না করলে আর গতি নেই। আর কার দরজায় যাব !" ইত্যাদি···

জমিদার দয়ালু-প্রকৃতির লোক ছিলেন। বারবার প্রতারিত হইবার ফলে যদিচ তাহাদের প্রতি বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হইয়াছিল, তবুও মৃত্যুর কথা যে বানাইয়া বলিবে, এমন তো হইতে পারে না। আর এদের অবস্থা তাঁহার অজানা ছিল না—যদিও ঐ দারিদ্র্যের জন্য তাহাদিগকেই দোষী করিতেন। একবার ইচ্ছা হইল তাড়াইয়া দেন। প্রয়োজনের সময় কোনকালে এদের ডাকিয়া পাওয়া যায় না। আজ নিজের গরজ পড়িয়াছে, তো আসিয়া কান্নাকাটির হাট বসাইয়াছে। কিন্তু একি দণ্ড দিবার সময় ! ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দু'টি টাকা তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

জমিদার দিয়াছেন, সুতরাং আর কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিল না,—কেহ দু'আনা কেহ চার আনা দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে পুরা পাঁচটাকা নগদ-নারায়ণ ট্যাকস্থ হইয়া গেল। কেহ কেহ ধান, গম দিল ; আবার কিছু কাঠও যোগাড় হইল। দুপুরে পিতাপুত্র শবাচ্ছাদন

বস্ত্র কিনিতে বাজারে বাহির হইল। প্রতিবেশী আত্মীয়, কুটুম্বগণ কাঠ ও বাঁশ কাটিতে ব্যাপৃত হইল। মেয়েরা আসিয়া বুধিয়ার শবদেহ ঘিরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

বাজারে পৌঁছিয়া ঘীসু বলিল, "কাঠ তো অনেক হয়েই গিয়েছে। কি বলিস মধুয়া?"

—হ্যাঁ, কাঠ তো মিলেছে। এবার কাপড় হলেই হয়।

—তাহলে চল, হালকা দেখে সস্তায় একখানা কিনে নিই।

—তা না তো কি! চিতেস তুলতে তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতে কে আর দেখতে আসবে, কাপড় ভাল কি মন্দ?

—ভেবে দেখ, কি বিচ্ছিরি রেওয়াজ। বেঁচে যতদিন ছিল, তখন ঢাকবার মত ছেঁড়া ন্যাকড়াও জোটেনি। এখন অক্কা পেল তো নতুন বস্তর চাই।

—কাপড় তো লাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলেই যাবে।

—তা না তো কি আর থেকে যাবে? এই পাঁচটি টাকা যদি আগে পেতাম দু'ফোঁটা ওষুধ পেটে পড়তে পারত।

এইভাবে একে অন্যের মনোভাব আঁচ করিতেছিল। উভয়ের মৌন গুপ্ত-সম্মতি অনুসারেই যেন বাজারে ঘোরাফেরা আরম্ভ হইয়া গেল। এক দোকান হইতে অন্য দোকান, এক গলি হইতে অন্য গলি। সূতী, রেশমী কতরকমের কাপড় উহারা দরদস্তুর করিল কিন্তু পছন্দ হয় না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন দু'জনেই এক দৈব প্রেরণা-বশে মদের দোকানের সামনে পৌঁছিয়া গেল। কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নাই, যেন সব আগে হইতেই স্থির ছিল। এইভাবে বাপবেটা দু'জনে ভিতরে পৌঁছিয়া, কিছুক্ষণ অব্যবস্থিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর

ঘীসু আড্ডাধারীর গদীর সামনে গিয়া বলিল—সাউজী, আমাদেরও এক বোতল দিতে আজ্ঞা হোক।

তারপর চাট আসিল—চাল ভাজা, মাছ ভাজা। দু'জনে নীরবে পান ও চর্ব্বণ করিয়া খাইতে লাগিল। বারুণী দেবী কিছুক্ষণ পরে ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। তখন দু'জনেরই মুখ খুলিয়া গেল।

ঘীসু আরম্ভ করিল, কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে কি আর স্বর্গ লাভ হত? এক মিনিটে জ্বলে ছাই! বউয়ের সঙ্গে তো যেত না।

মাধব ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া যেন ইষ্টসাক্ষী করিতে করিতে বলিল, "দুনিয়ার এই নিয়ম। না হলে লোক ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার টাকা কেন দেয়? কেউ কি আর দেখছে, দানপুণ্যের ফলে পরলোকে কিছু মিলে কি না?"

—বড়লোকের টাকা আছে—তারা যত খুশী উড়াক না। আমাদের ···আমাদের আছে কী!

তখনও চেতনা আছে। মাধব বলে, "কিন্তু লোকের কাছে কি জবাবদিহী করবে? সকলে যে জিজ্ঞেস করবে, কাপড় কি হল?"

ঘীসুর সুরা-বিকশিত অধরে মৃদুহাসি খেলিয়া গেল,—"বোলে দেব টাকা হারিয়ে গেছে, ট্যাঁক থেকে, সুড়ৎ করে কোথায় পড়ে গেছে। অনেক খুঁজলুম, পাওয়া গেল না। তাই তো এতো দেরী হল···কেউ বিশ্বাস করবে না—এটা ঠিক। কিন্তু দেখিস, টাকা ওরাই আবার দেবে। গ্রামে কি লাশ পড়ে থাকবে মনে করিস?"

মাধবের মন এবার সুরায় ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল, "বুধিয়া ছিল বড় ভাল মেয়ে। খেটেখুটে এতদিন খাওয়ালে, মরলো তো আমাদের আর একবার ভাল করে খাবার পথ করে মরল।"

বোতলের অর্দ্ধেক ততক্ষণে কাবার হইয়াছে। ঘীসু দু'সের পুরী

আনাইল। তার সঙ্গে সামনের দোকান হইতে চাটনি, আচার ও পাঁঠার মেটুলী। তদ্গতচিত্তে দু'জনে পানভোজনে ব্যাপৃত হইল—যেন কোন ভাবনা-চিন্তা ভয়-অনুতাপ নাই।

সহসা ঘীসুর মধ্যে সাধু বাবাজী জাগিয়া উঠিল। বলিল, "ভেবে দেখ, আমাদের মন যদি খুশী হয়, বুধিয়ার কি তাতে সদ্গতি হবে না?"

মাধব শ্রদ্ধাভরে শির ঝুকাইয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা আর বলতে। ভগবান, তুমি তো অন্তর্যামী। বেচারীকে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দিয়ো। আমরা দু'জনে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ দিচ্ছি: বুধিয়ার কল্যাণ হোক। মরে আমাদের যা খাইয়ে গেল, বেঁচে থাকলে তা পারত না। জীবনে আর এমন খাইনি।"

বলিয়া একসঙ্গে তিনখানা মেটুলি মুখে পুরিল। ঘীসু কষ্ট শঙ্কিত সত্ত্বে, নিজের প্লেট একটু তফাতে সরাইল। কিছুক্ষণ পরে মাধবের মনে এক সংশয় উপস্থিত হইল।

—বাবা, আমরাও তো একদিন ওখানে পৌঁছব?

ঘীসু অতসব ভাবিতে চায় না। বেশী ভাবিলে নেশা ছুটিয়া যায়। কিন্তু মাধব দমিবার পাত্র নয়।

—বাবা, ওখানে দেখা হলে যদি বুধিয়া জিজ্ঞেস করে আমাকে কাপড় কেন দাওনি, তবে কি জবাব দেবে?

ঘীসু ঝাঁঝাইয়া উঠিল, "জবাব তোর মাথা। বকবক বকবক করেই যাচ্ছে। দুশ্‌মন কোথাকার!"

মাধব কিন্তু নাছোড়বান্দা।—জিজ্ঞেস করবেই! বাওয়া,…বল না বাওয়া।

ঘীসু এবার সান্ত্বনা দিবার ভঙ্গিতে কহিল, "কি করে জানলি যে ও

কাপড় পাবে না? আমাকে কি এমনি গাধা পেয়েছিস? ষাট বছর কি ঘাস কেটেই এলুম? তোকে বলছি, ওর কাপড় হবেই, আর, ভাল কাপড়ই হবে।"

কিন্তু মাধবের বিশ্বাস হয় না। জেদ ধরিয়া বসিল, "কে দেবে শুনি? টাকা তো সব তুমি উড়িয়েই দিলে"…

বলিয়া একসঙ্গে তুড়ি দিবার ও পাখী উড়িবার মুদ্রা দেখাইল। তারপর বলিল—"আর জিজ্ঞেস করবে তো আমাকে। আমিই তো ওর মাথায় সিঁদুর পরিয়েছিলাম। তুমি তো অমনি খালাস। তোমার কি।"

বলিয়া মাধব চিন্তার ভারে মাথা নোয়াইল।

ঘীসুর মেজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "হাবামজাদা, আমি বলছি কাপড় ও পাবেই, ফের তুই বলিস পাবে না?"

ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য একমুঠা চানা চিবাইতে হইল। মেটুলি আর ছিল না। আঁধার ঘনাইতেছে; ক্রমে আড্ডা উন্মাদের মেলায় পরিণত হইতেছে। কেহ কাঠ-ফাটা গলায় গান ধরিয়াছে, কেহ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা দিতেছে। কেহ সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রেমনিবেদন করিতেছে এবং প্রেমের প্রমাণস্বরূপ মদের গেলাস প্রেমাস্পদের মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। সেখানকার হাওয়ায় নেশা ধরায়। সেই সব অপ্রকৃতিস্থ মানুষ দেখিতে দেখিতে যেন সুস্থ লোকেরও মাথার মধ্যে ঊনপঞ্চাশ পবন নৃত্য করিতে থাকে। কেহ কেহ দুই এক চুমুক পান করিয়াই পুরদস্তুর মাতাল। মধুশালা—জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি এক বিচিত্র জায়গা…মত্তাবস্থা—জীবন-মৃত্যুর মিশ্রণ।

ঘীসুর চীৎকারে সকলের দৃষ্টি উহাদের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল

শতচক্ষুর সম্মিলিত দৃষ্টিতে যেন যাদু আছে। পিতাপুত্র আবার শান্ত হইয়া বারুণী স্নান করিতে লাগিল। বোতলবাহিনী ক্ষীণধারা হইয়া আসিতে আসিতে শেষকালে উভয়ের উদর-সাগর-সঙ্গমে বিলুপ্ত হইয়া গেলেন।

পেট ভরিয়া খাইবার পরে পুরীর যা কিছু অবশিষ্ট রহিল, মাধব পাতা সমেত তাহা উঠাইয়া, রাস্তার ধারে সতৃষ্ণনয়নে-অপেক্ষমান এক ভিখারীকে দিয়া দিল। আজ তাহারা শুধু নিজেই তৃপ্ত হয় নাই, অন্যকে আনন্দের ভাগ দিয়া প্রথমবার দানের পুণ্য অর্জ্জন করিল।

ঘীসু পুরী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বক্তৃতাও দিল। "খুব খা বাওয়া, আর পেট ভরে আশীর্ব্বাদ কর। টাকা যে কামালে, সেতো আর নেই কিন্তু তোর আশীর্ব্বাদ একেবারে মোক্ষমস্থানে, এখানে পৌঁছে যাবে—"

বলিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। তারপরে এক 'পুনশ্চ' জুড়িয়া দিল—"ভারী মেহনতের কামাই বাওয়া।"

মাধব অনেকক্ষণ হইতেই আকাশের দিকে তাকাইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু মাথা ঝুকিয়া পড়িয়া যায়। অবাধ্য শিরকে জোর ঝাঁকুনি দিয়া উর্দ্ধনেত্র হইয়া কহিল, "ও নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে যাবে, এ নির্ঘাৎ বলে দিলাম। বৈকুণ্ঠে রাণী হবে।"

এবার মাধবের সঙ্গে ঘীসুর পুরামতো মিল হইল। সোল্লাসে বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ বেটা, বৈকুণ্ঠে তো যাবেই। তার আর কথা কি। কাউকে কষ্ট দেয়নি, কাউকে ঠকায়নি। মরণের পরেও আমাদের এতদিনের অতৃপ্ত ইচ্ছা পুরো করে গেল। ও বৈকুণ্ঠে যাবে না তো কি বিশমুনে শালারা যাবে, যারা বসে বসে পরের পয়সায় ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। পাপ ধোবার জন্য ওরা গঙ্গা নায়; মন্দিরে মন্দিরে ভেট চড়ায়, কিন্তু ওতে কি আর পাপ যায়?"

পিতা-পুত্রে সহসা মিল হইয়া গেল। দুইজনে দুইজনকে জড়াইয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

মাধবের কান্না আর থামে না।

ঘীসু নিজের অশ্রু সম্বরণ করিয়া মাধবকে সান্ত্বনা দেয়। "আরে, সে তো মরে বেঁচে গেল!"

মাধব চকিতে বুঝিতে পারে, সেই যুক্তির পরম সার্থকতা। কান্না থামিয়া যায়। পরিবর্ত্তে সে গান গাহিয়া উঠে—ঠগিণী কিঁউ নয়না ধমকাবেঁ···ঠগিণী।

গান গাহিতে গাহিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গানের ভাষা আর নাই···শুধু সুর···সেই সুরে সুরে সে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। ঘীসুও তাহার সহিত যোগদান করিল। কিছুক্ষণ পরে মাটি তাহাদের দুইজনকেই একসঙ্গে আকর্ষণ করিয়া লইল।

আর কোন শব্দ নাই।

আড্ডাধারীরা শোকার্ত্ত পিতা-পুত্রকে টানিয়া একধারে শোয়াইয়া দিল। বারুণী-প্রসাদ-পুষ্ট নিদ্রার অতল গভীরে তাহারা ভুলিয়া গেল. হতভাগিনী বুধিয়ার মৃতদেহ তাহাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

লণ্ড এ নগার

পৃথিবীতে এমন লোক আছে যারা নিজের জন্য পরের চাকরী করে না, অথচ বিনা পয়সায় দুনিয়া-সুদ্ধ সকলের স্বেচ্ছাবৃত দাসত্ব করে। নিজের কোন কাজ নাই, তাই মাথা তুলিবার ফুরসৎ নাই। পরোপকার ব্যাপারটা শিক্ষিত সাধারণের দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার মধ্যে পড়ে না

বলিয়া এমনিতেই পরোপকারীকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। কেহ ভাবে লোকটার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; কেহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে; কেহ অহেতুক গাত্রজ্বালা অনুভব করে। যদি লোকটির নিজের অবস্থা সচ্ছল হয়, তবে তাহার পরসেবা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। যাহার নিজের অন্নবস্ত্রের ভাবনা নাই, সে যদি পরের ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, তবে তাহার ধরন-ধারণ ক্রমে লোকের গা-সহা হইয়া যায়। কিন্তু জামিদের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। তিন কুলে কেহ নাই। ভাঙ্গা এক কুড়ে ঘরে যেন-তেন করিয়া পড়িয়া থাকে। ষণ্ডা জোয়ান চেহারা; কাজকর্ম্ম করিলে পাঁচজনের সংসার একেলা চালাইবার ক্ষমতা রাখে। খাটেও খুব। অনবরত দৌড়াদৌড়িতে লাগিয়াই আছে। কিন্তু ঐ এক দোষ—উপার্জ্জনের দিকে মন নাই। বুঝাইয়া সমঝাইয়া ঘরসংসার বসাইয়া দিবে, এমন কোন আত্মীয়ও নাই। সুতরাং বনের মহিষ তাড়াইতেই পরমানন্দে লাগিয়া থাকে। তবে ঘরের খাইয়া নহে। এ বিষয়ে একান্ত পরনির্ভর। দু'টি মিষ্ট কথার বিনিময়ে যাহারা ভূতের মত খাটাইয়া লয়, তাহারাই যাহোক কিছু সামনে ধরিয়া দেয় এবং সে পরমহংসের মত নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করিয়া যায়।

অশিক্ষিত গ্রামের লোক অতশত মনস্তত্ত্ব বোঝে না; সুতরাং জামিদ হয়ত উক্তরূপ সৃষ্টি-বহির্ভূত আচরণ করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু মুসকিল বাঁধাইয়াছে তাহার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি। মধ্যযুগীয় নাইটদের মত, সে যে শুধু পীড়িতের পীড়া নিবারণে অগ্রসর তাহাই নহে, পীড়কের সন্ধান পাইলে, তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বোঝাপড়া করিতেও প্রস্তুত। ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে সারারাত্রি জাগিতে যেমন ওস্তাদ, কনেস্টবলের ও জমীদারের পাইক

পেয়াদার সঙ্গে হাতাহাতি করিতেও তেমনি পারদর্শী। সে বোঝে না যে, যে লোক অত্যাচার সহিতে অভ্যস্ত, সে তাহার সাহায্যদানকে অনেক সময় উৎপাত মনে করে।

দুই-চারিবার এই রকম হাঙ্গামা হুজ্জতে লিপ্ত হইবার পর, গ্রামের লোক একজোট হইয়া তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিল। তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে জামিদের নিজের ভালর জন্যই এবার উপার্জ্জনের জন্য কোথাও বাহির হওয়া উচিত। এখন না হয় গায়ে জোর আছে, অসুখ-বিসুখও হয় না, কিন্তু চিরকাল যৌবনের তেজবীর্য্য থাকিবে না; তখন কি করিবে? ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এখন হইতেই টাকাকড়ি কিছু কিছু উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করা দরকার।

লোকের উপদেশের ফলেই হউক, অথবা খামখেয়ালী স্বভাবের বশেই হউক, জামিদ একদিন গ্রাম ছাড়িয়া সহরের পথ ধরিল। সহরে পৌঁছিয়া তাহার চক্ষে পলক পড়িতে চায় না। বিস্ময়ের অবধি নাই। যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। অগুন্তি বড় বড় বাড়ী, বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, গাড়ী-ঘোড়া, অবিচ্ছিন্ন জনস্রোত, বিচিত্রবেশ নর-নারী। এক সঙ্গে যেন দশটা খেলা বসিয়াছে।

কত রকমের শব্দই যে হইতেছে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু জামিদের সর্ব্বাধিক বিস্ময় লাগিল মন্দির মসজিদের সংখ্যা দেখিয়া। সেবাপরায়ণ লোকের মন সহজেই ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। অগণিত দেবস্থান দেখিয়া জামিদের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার গ্রামে না ছিল মন্দির, না ছিল মসজিদ। হিন্দুবা এক বৃক্ষমূলে ফুল জল নিবেদন করিত, রামলীলার সময় তাহারই চারপাশে উৎসব হইত। মুসলমানেরা এক খোড়োঘরে একত্রিত হইয়া নামাজ পড়িয়া লইত। এখানে দু-পা যাইতে

না যাইতেই বিপুলকায় দেবায়তন। জামিদের মনে হইল, সেই অগণিত অপরিচিত জনতার মধ্যে, গগনচুম্বী হর্ম্মরাজির মধ্যে চির পরিচিত আশ্রয়স্থল বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাবিয়া তাহার আনন্দ ধরে না।

এদিক ওদিক নানা স্থান, নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাত্রির জন্য মনে মনে আশ্রয়স্থল অন্বেষণ করিতেছে, সামনে দেখে মন্দির। একে তো গ্রামে শিক্ষা দীক্ষার অভাব, দ্বিতীয়তঃ মন্দির মসজিদের অভাব। সুতরাং হিন্দু মুসলমানে ভেদ-বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক ঘটনা এমনিতেই গ্রামে কম। পরোপকারী বলিয়া জামিদের গ্রামে সব হিন্দু-গৃহে অবাধ গতিবিধি ছিল। তাই জামিদ বিনা সঙ্কোচে রাস্তা হইতে মন্দিরের চাতালে উঠিয়া আসিল। আলো জালিয়া পূজারী হয়ত কোথাও গিয়াছেন। লোকজন নাই। শুধু তাই নয়। মন্দিরের চাতাল নোংরা যতদূর হইতে পারে। এখানে ওখানে গোবরের তাল শুখাইয়া আছে, ধূলা, খড়-কুটায় সমস্ত রোয়াক ভর্ত্তি। জামিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া বিশ্রাম করিল। তারপর ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল কোথাও একগাছা ঝাড়ু পায় কি না। ঠাকুরজীর মন্দির, কিন্তু কি দুরবস্থা। ঝাড়ু না পাইয়া সে নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়া রোয়াক ঝাড়িতে লাগিল।

আস্তে আস্তে দু-একজন করিয়া ভক্ত সমাগম হইতেছে। অল্পক্ষণ পরে সন্ধ্যারতি হইবে। জামিদের উপর একজনের দৃষ্টি পড়াতে তিনি নিজের পার্শ্ববর্ত্তীকে বলিলেন,—

—এ আবার কে? দেখে তো মুসলমান মনে হচ্ছে।

—মেথর হতেও পারে।

—মেথর কি নিজের কাপড় দিয়ে ঝাঁট দেয়? আমার মনে হচ্ছে কোন পাগল।

—কে জানে পুলিশের টিকটিকি কি না।

—না না, দেখছ না কি রকম দীন-হীন মনে হচ্ছে।

—তা হলে বোধ হয় হাসান নিজমীর কোন চেলা।

—তুমিও যেমন! গোবর কুড়িয়ে নিচ্ছে। ইঁটের ভাটায় কাজ করে হয়ত। (জামিদের প্রতি) এই শোন, গোবর নিয়ে যাসনে যেন।

জামিদ—"আমি ভিন্‌দেশী মুসাফির, গোবর নিয়ে করব কি। ঠাকুরজীর মন্দির দেখে এসে বসেছি। চারদিক নোঙরা হয়ে আছে। তাই পরিষ্কার কচ্ছিলাম!"

—তুমি মুসলমান না?

—ঈশ্বর সবাকারই ঈশ্বর,—হিন্দু কি আর মুসলমান কি।

—তুমি ঠাকুরজীকে মান?

—মানি বই কি! কে মানে না। আমায় যিনি স্মৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মানব না? ভক্তেরা নিজেদের মধ্যে ঠারে ঠোরে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

—গাঁ থেকে আনকোরা উজবুক এসেছে মনে হচ্ছে। যেচে যখন ধরা দিয়েছে, যেতে না পায়।

জামিদ ফাঁদে পড়িল। তাহার আদর আপ্যায়নের বহর দেখিয়া সে নিজেই অবাক। গাঁয়ের লোক তাহাকে নির্ব্বোধ বলিত। একবার আসিয়া দেখিয়া যাক না। ভক্তেরা তাহাকে চমৎকার এক ঘরে থাকিতে দিয়াছে। দু'বেলা চর্ব্ব্য-চোষ্যের ব্যবস্থা। জামিদ ভাল কীর্ত্তন গাহিতে শিখিয়াছিল। আদর সম্মানে অত্যন্ত খুশী হইয়া একদিন কীর্ত্তন শোনাইয়া দিল। তার পরে আর তাহাকে পায় কে। আশে পাশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল যে এক পরম ভক্ত বিদ্বান মৌলবী স্বেচ্ছায়

শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইবেন। শত শত লোক তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। জামিদের তো রকম সকম দেখিয়া তাক লাগিয়া গিয়াছে। তাহার একমাত্র আফসোস গ্রামের লোক দেখিতে পাইল না। গ্রামে যখন ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে, কেহ বিশ্বাস করিবে কি না কে জানে। দু'চার জন লোক সব সময় তাহাকে ঘিরিয়া থাকে, যেন সে গ্রামের জমিদার।

একদিন জামিদ জন কয়েক ভক্তের সঙ্গে বসিয়া পুরাণ পাঠ শুনিতেছে, এমন সময় দেখিল, এক বলবান শিখাসূত্রতিলকধারী যুবক এক বৃদ্ধকে রাস্তায় ধরিয়া বেদম প্রহার করিতেছে। বেচারা বুড়া হাতে পায়ে ধরিয়া, অনবরত ক্ষমা চাহিয়া কিছুতেই যুবকের ক্রোধ শান্ত করিতে পারিতেছে না। তিলকধারীর রাগ আর পড়ে না। জামিদ তৎক্ষণাৎ তিন লাফে রাস্তায় আসিয়া বুড়াকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। যথাসম্ভব শান্তস্বরে বলিল, বুড়ো মানুষের উপর হাত তুলছ যে? হয়েছে কি?"

—মেরে মেরে আমি ওর হাড় গুড়ো করে তবে ছাডব। তুমি সরে যাও বলছি।

—কি হয়েছে বল না? ওর দোষটা তো শুনি।

—ও ব্যাটার মুর্গী আমার ঘরে ঢুকে সমস্ত ঘর নোংরা করে এসেছে। সর, সামনে থেকে সর।

—তা বুড়ো কি মুর্গীকে শিখিয়ে দিয়েছিল? অবোধ জানোয়ার অজানতে দোষ করেছে, তার জন্যে তুমি তার মালিককে ধরে ঠেঙ্গাচ্ছ? তা-ও আবার ষাট বছরের এক বুড়ো। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ বেদনায় কাতরাইতে কাতরাইতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"রোজ খাঁচায় বন্ধ করে রাখি, হুজুর। আজ ভুলে খাঁচার

দরজা খোলা পড়েছিল। হাতজোড় করে পায়ে ধরে মাপ চাইছি কিন্তু পণ্ডিতজীর দয়া হল না। মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছেন হুজুর।"

যুবক—"এখনই তোর হয়েছে কি। আজ তোকে মাটিতে না পুঁতে আমি ছাড়ব না।"

জামিদ—"পণ্ডিতজী মহারাজ মাটিতে পুঁতে ফেলতে ওস্তাদ কি তুমি একাই। ফের যদি তুমি ওর গায়ে হাত তোল, তবে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

উহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিলকধারী আবার বৃদ্ধকে চপেটাঘাত করিল। জামিদ লাফাইয়া তাহার উপর পড়িয়া কিল চড় ঘুসী বর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর দু'জনের মল্লযুদ্ধ। ভক্তেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। এখন নামিয়া আসিয়া পণ্ডিতের পক্ষ লইলেন ও জামিদকে একজোট হইয়া মারিতে লাগিলেন। এবার জামিদের আর এক প্রস্থ অবাক হইবার পালা। এই তো ইহারা তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছিল, এরই মধ্যে কি হইতে কি হইয়া গেল। চোখের সামনে বৃদ্ধের উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ দেখিয়া কেহ কিছু বলে নাই। ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যেই সে বৃদ্ধকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল, অমনি উহাদের হইল কি ?

কিন্তু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার অবসর কোথায়! ছয়-সাত জন লোক একজনকে আক্রমণ করিয়াছে। বৃদ্ধ মুসলমান গোলমালের মধ্যে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল। জামিদ একা লড়িতে লড়িতে মার খাইতে খাইতে শেষ কালে অজ্ঞান হইয়া রাস্তার ধারে নর্দ্দমার কিনারে পড়িয়া গেল।

ভক্তেরা এতক্ষণে দম লইবার অবকাশ পাইলেন। মন্দিরে ফিরিয়া

বলাবলি করিতে লাগিলেন, "নাহোক এতগুলো টাকা গচ্ছা গেল। পর কি আর কখনও আদর-আপ্যায়নে আপন হয়! দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা!"

যখন জামিদের চেতনা হইল রাস্তা তখন জনশূন্য। গায়ে তাহার এমন ব্যাথা যে উঠতে পারে না। চোখের উপরটা ভীষণ ফুলিয়াছে; ঠোট দু' জায়গায় কাটিয়া গিয়াছে, নাকের কাছটায় রক্তের চাপ জমিয়া আছে। মাথা ফাটে নাই, তবে এখানে ওখানে সুপারীর সমান উঁচু হইয়া আছে। জামিদ একটু সরিয়া সেখানেই পড়িয়া রহিল। সারারাত্রি ভূমিশয্যায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া প্রভাতের দিকে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, গায়ের ব্যাথা তখন কিছু কমিয়াছে। মুখে মাথায় টাটানি সমানই আছে। জামিদ কষ্টে স্বষ্টে উঠিয়া রাস্তার কলে হাত মুখ ধুইল। শীতল জল স্পর্শে, প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় অবসাদ খানিকটা দূর হইলে জামিদ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তা বাহিয়া চলিল। কিছুদূর যাইতেই দেখিল এক মসজিদ। ভিতরে যাইবে কিনা ভাবিতেছে; দেখে গত সন্ধ্যার সেই প্রহৃত বৃদ্ধ তাহার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়াই আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল—"কসম খুদা পাক্‌কী, ধন্য তোমার সাহস। সাবাস বাহাদুর। তুমি কাল আমার জান বাঁচিয়েছ। কাফের ব্যাটারা তোমায় নাকি খুব মেরেছে শুনলাম। আমি তো ভীড়ের মাঝে বেমালুম সরে পড়েছিলাম। এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এখানে সব লোক তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। চলো চলো, ভেতরে যাই। কাজী সাহেব রাত্তিরেই তোমার খোঁজে বেরোবেন স্থির করেছিলেন কিন্তু লোকজন তেমন ছিল না, আর একেলা বেরুতে সাহস পেলেন না। তখন সব নমাজ পড়ে ঘরে চলে গিয়েছে। যখন আমাদের

ওরা মার-ধোর করছিল, ঠিক সেই সময়ে খবর পৌঁছে গেলে হাজার লাঠিয়াল পৌঁছে যেত! আল্লার কসম, আমি আজ থেকে ছ'টা নতুন মুর্গী পালব। দেখি কাফের ব্যাটা কি করে।"

জামিদকে লইয়া বুড়া, কাজী জোরাবর হুসেনের ঘরে পৌঁছিল। কাজী উওজু করিতেছিলেন, জামিদকে দেখিয়াই বদনা রাখিযা দৌড়িয়া আসিলেন, "রাতভোর তোমারই জন্য ছটফট করছিলাম। একলা এতগুলো কাফেরের মোহড়া নিয়েছে, বাহাদুর বটে! আর হবেই বা না কেন? মোমিনের রক্ত যে। কাফির ব্যাটাদের সাধ্য কি? শুনছিলান ব্যাটারা তোমায় শুদ্ধি করতে যাচ্ছিল। ভুল হল, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে না। বিয়ে দিয়ে দিলেই, নাজনীর সঙ্গে করে এখানে এসে উঠতে।"

খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। যেমন মন্দিরে, তেমনি এখানেও দলে দলে দর্শনার্থী আসিতে লাগিল। সকলের মুখেই এক কথা: 'বারে হিম্মৎ, বারে মেরে বাহাদুর শের! লোহোল বিলা কুবৎ?' আবার সেই রকম আদর-আপ্যায়নে দিন কাটিতে লাগিল। কাজী সাহেবের পাশের কামরা খালি করিয়া জামিদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

এক প্রহর রাত হইয়াছে। রাস্তায় লোক চলাচল তেমন নাই। জামিদ কাজী সাহেবের নিকট পাঠ লইয়া আসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থে মনোনিবেশ করিতেছিল। সহসা তাহার ঘরের পাশের দরজার সামনে টাঙ্গা থামিবার শব্দ হইল। কাজীর কোন চেলা আসিয়াছে বোধ হয়—প্রায়ই আসে যায়। কাফিরদের কি ভাবে, কোথায় কখন জব্দ করিতে হইবে, —তাহার সলা পরামর্শ লাগিয়াই আছে। কিন্তু কি জানি কেন কৌতূহল হইল,—সে জানলা দিয়া মাথা গলাইয়া রাস্তার দিকে চাহিল। একজন

স্ত্রীলোক টাঙ্গা হইতে নামিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। টাঙ্গাওয়ালা তাহার জিনিসপত্র নামাইতেছে।

মহিলা এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "না, এ-বাড়ী তো নয়। তুমি ভুল করেছ মনে হচ্ছে।"

টাঙ্গাওয়ালা, "হুজুরের তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। বল্লাম যে বাবুজী বাড়ী বদলে এখানে এসে উঠেছেন। এক্ষনি দেখতে পাবেন। উপরে চলুন।"

মহিলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত, কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বাবুকেই ডেকে দাও না। হাঁক লাগাও।"

টাঙ্গাওয়ালা আশ্বাস দিয়া বলিল, "বলেন কি হুজুর? এত রাতে হাঁক লাগাব কি? খামোখা চেঁচিয়ে কি লাভ? জানা কথা, বাবুজী শুয়ে পড়েছেন। আপনি নিঃসঙ্কোচে উপরে চলে যান।"

মহিলা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। টাঙ্গাওয়ালা জিনিস পত্র লইয়া পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল।

এদিকে কাজী টাঙ্গার শব্দ শুনিয়াই ছাতে চড়িয়া এদিক-ওদিক দেখিতেছিলেন। এক স্ত্রীলোক একলা টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে আসিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যাপার বুঝিলেন। এ রকম ঘটনা মাঝে মাঝে এখানে ঘটে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের কামরায় নামিয়া আসিয়া চারিদিকের জানলা বন্ধ করিয়া দিলেন ও দেয়ালে লটকানো তলোয়ার পাড়িয়া লইয়া দরজার আড়ালে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহিলাটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, কামরার সম্মুখে আসিয়া প্রবেশ করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন। টাঙ্গাওয়ালা বিছানাপত্র লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। সহসা কাজী দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাঁ হাতে তাহার হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিলেন। ঘরে

টানিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিবেন, এমন সময় জামিদ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে সানন্দে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"এসো এসো মিঞা, ভেতরে এসো : তোমার বরাতের জোর খুব,—তা মানতেই হবে।" জামিদও ঘরে ঢুকিল, কাজীও দরজা বন্ধ করিলেন। জামিদ আহম্মকের মত একবার এর একবার ওর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

মহিলা টাঙ্গাওয়ালার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তুই আমায় কোথায় নিয়ে এলি ?"

কাজী তলোয়ার ঘুরাইয়া জবাব দিলেন, "সব বুঝতে পারবে। চুপ চাপ ওখানে বসে পড়।"

—চেহারায় মনে হচ্ছে তুমি কোন মৌলবী। তোমার ধর্ম্ম, তোমায় কি অন্যের অসহায় স্ত্রী-কন্যার সর্ব্বনাশ করিতে শিখিয়েছে ?

—খুদার এই হুকুম যে কাফিরদের যেভাবে হউক সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হবে। ইচ্ছা করে না আসে তো বলে আনতে হবে।

—এই রকম তোমাদের স্ত্রী কন্যাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে বেইজ্জত করে, তো ?

—তোবা, তোবা, কাফিরদের এমন হিম্মৎ কোনদিন হবে ? হিন্দুর মধ্যে আবার সাহস আছে নাকি ? আমাদের একটি মেয়ের গায়ে হাত তুললে আমরা দশ হিন্দুর মাথা কেটে নিই। হিন্দুর মেয়ে তো আমরা আকছার ধরে এসে মুসলমান করছি। কেউ টুঁ শব্দটি করতে শুনেছ কখনো ? আর বেইজ্জতির কথা কি বলছ। হিন্দুসমাজে তো তুমি বাক্স পেঁটরার সামিল। মুসলমান হয়ে প্রথমবার পুরুষের সমান অধিকার পাবে। আমরা বেইজ্জত করি না, তোমাদের ইজ্জত বাড়াই।

—ভাবছ কি হিন্দু চিরকাল মার খেতেই থাকবে ? সেও জাগলো বলে। সুদে আসলে সব ফিরে পাবে তোমরা, কাণাকড়িটি মারা যাবে

না। এত কালের পাপের শাস্তি তোমাদের তোলা আছে।

—কিন্তু বিবিজান, এত রাগছই বা কেন? এই যে জোয়ান পুরুষটিকে দেখছ ওরই সঙ্গে তোমার নিকে করে দেব। তারপর রাণী হয়ে থাকবে।

—আমি তোমাকে আর তোমার ধর্ম্মকে ঘৃণা করি। তুমি কুকুরেরও অধম। ভাল চাও তো আমার ছেড়ে দাও। নইলে আমি চেঁচিয়ে হাট বসাব।

—যদি টুঁ শব্দটি কর, তবে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার জিভ কেটে ফেলবো। বুঝে সুজে চল।

—ধর্ম্মের তুলনায় প্রাণ তুচ্ছ। তুমি আমার প্রাণ নিতে পার, আমার সতী-ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারবে না।

—কেন সেধে মৃত্যুকে ডেকে আনছ, বিবিজান?

মহিলা দরজার পাশে গিয়া বলিলেন, "দরজা খোল বলছি।"

কাজী উহার হাত ধরিয়া টান দিতেই জামিদের স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া গেল। সে দু'জনের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল। কাজীকে ধীর স্বরে বলিল, "একে ছেড়ে দিন।"

—কি বকছিস? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোর? যার জন্যে চুরি করে, সেই বলে চোর! মহা নেমকহারাম বেইমান দেখছি।"

—মাথার কথা পরে ভেবো। ভাল চাও তো একে ছেড়ে দাও।

কিন্তু কাজী হাত ছাড়িল না। এদিকে টাঙ্গাওয়ালাও কাজীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। জামিদ ক্ষিপ্রগতিতে টাঙ্গাওয়ালাকে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজীর পেটে এক লাথি মারিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে মহিলাকে লইয়া রাস্তায় নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোন্ মোহল্লায়, বোন?"

—আহিয়াগঞ্জে।

—এসো, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই।

—আপনি আজ আমার ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন। এখন বুঝলাম, ভাল মন্দ সব জাতে সব সমাজে আছে। আমার স্বামীর নাম পণ্ডিত রাজকুমার শাস্ত্রী। ঐ মহল্লাতে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

—জিজ্ঞাসা করব কাকে? কাউকে দেখতে পেলে তো! রাত তো কম হয়নি। আর তুমি একেলা আসছিলে যে?

—পণ্ডিতজী স্টেশনে যাবেন কথা ছিল। কেন যে গেলেন না জানিনে। এ সহরে এতকাল থেকে আছি। এ রকম বিপদ যে ঘটতে পারে তা মনে হয় নি। আজকাল মেয়েরা একা একা রেলে মোটরে চড়ে। আমিও এলাহাবাদ থেকে গাড়ীতে একাই এসেছি। পণ্ডিতজীকে না দেখে ভাবলুম, টাঙ্গা করে বাড়ী যাই। বেছে বেছে বুড়ো দেখে টাঙ্গাওয়ালা খুঁজে বার করলুম, শেষে হল হিতে বিপরীত।

জামিদের হঠাৎ যেন বুদ্ধি খুলিয়া গেল। মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল—"অত লোকের সঙ্গে রেলে চড়া আর একা একা টাঙ্গায় চড়া কি এক?"

মোড়ে একখানা পানের দোকান খোলা ছিল। সেখানেই খোঁজ খবর লইয়া তাহারা রাজকুমার শাস্ত্রীর বাড়ী যখন পৌঁছিল, তখন রাত সাড়ে বারোটা। জামিদ নাম ধরিয়া হাঁক দিতেই, শাস্ত্রী আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন। স্ত্রীকে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের ভাব কাটিলে বলিলেন, "তুমি ছিলে কোথায় হীরা? তোমার ভাই ও আমি স্টেশনে গিয়ে কত খোঁজাখুজি। শেষকালে মনে হল, তুমি আসনি। এক শুদ্ধির ব্যাপার নিয়ে সহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা হবার উপক্রম। এইমাত্র আমরা

ফিরে এসে দারুণ দুশ্চিন্তায় মুখ চুণ করে বসে আছি। তারপর, এ লোকটি কে ?”

—বলছি সব। আপাততঃ এই জেনে রাখ যে ইনি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তার চেয়ে বড় কথা ধর্ম্ম বাঁচিয়েছেন।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম জানতে পারি ?”

—জামিদ।

ততক্ষণে হীরার ভাই আসিয়া জুটিয়াছে। সে আসিয়া জামিদকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল। “এই দেড়ে ব্যাটা এখানে এল কি করতে ? মরার আর জায়গা পেলে না বুঝি ? যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি বুঝি ?” বলিয়াই ঘুসি বাগাইয়া অগ্রসর হইল।

হীরা তাড়াতাড়ি তাহার সামনে আসিয়া তাহার পথ রোধ করিল। “কর কি ; কর কি দাদা ? তুমি জান ইনি কে ?”

—জানিনে আবার ? একে নিয়েই তো যত গোল। সেদিন মেরে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছিলাম।

—না জেনে তুমি মহা অধর্ম্ম করেছ, দাদা। ইনি আমার প্রাণদাতা, মানরক্ষক। এঁর কাছে মাপ চাও।

বলিয়া সে নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া সজল চক্ষে জামিদের পদধুলি লইল।

পরদিন জামিদ সহরের খুরে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া তাহার মন্দির-মসজিদহীন, শিক্ষাদীক্ষাশূন্য গ্রামে ফিরিয়া গেল।

বনিয়াদের ইঁট

মুসলমান আমলে সাহারাণপুর জেলায় এক গ্রাম ছিল। নাম বহেড়া। আজ লোকের নিকট উহা সন্দল সিং-এর বহেড়া নামে পরিচিত। কে এই সন্দল সিং?

সে ছিল এক অতি সাধারণ চাষী গৃহস্থ। কিন্তু অনেক দান ধ্যান পুণ্য করিয়াও সম্পন্ন গৃহস্থের ভাগ্যে যে খ্যাতি ঘটে না, সন্দল সিং তাহা পাইল। এবং শুধু মৃত্যুর পরে নহে, তাহার জীবিতকালেই সমস্ত জেলাময়, গ্রামের নামের সঙ্গে তাহার নাম যুক্ত হইয়া গেল। গ্রামের জমিদার মনে করিতেন সন্দল সিং তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছে, তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করিযাছে। গ্রামের ভূস্বামী তিনি, লোকে বলে কি না সন্দল সিং-এর বহেড়া। সত্য সত্যই ভিন্ন গ্রামের লোক সন্দল সিংকেই গ্রামের জমিদার মনে করিত। এই সব কারণে জমিদার মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং গ্রামের অন্য সকলে তাঁহার এই মহৎ ক্রোধের অংশীদার ছিল। সকলেই মনে মনে জ্বলে, এবং নিজের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বিষোদগার করিয়া মনের জ্বালা মিটায়।

মুখিয়া লম্বরদার বলাবলি করিতেন—"বাবু সাহেবের নিজের দু'বিঘে জমী নেই, হয়ে বসেছেন সারা গাঁয়ের মালিক। আর বলিহারি চেহারার জলুস। সাক্ষাৎ চামার।"

গ্রামের চাষীরাও সন্তুষ্ট ছিল না। বলিত—"আছে তো দু'খানা মাত্র লাঙ্গল—যে কোন চাষীর অবস্থা ওর চেয়ে ভাল। তবু ওঁর নামখানিতে এমন কি মধু আছে যে গাঁয়ের নাম আটার মত ওঁরই নামের সঙ্গে জুড়ে যাবে।" যারা অল্পভাষী, কথা কম বলে বলেই যে কম জ্বলে তা নয়। ভাবে—লোকটার বরাত বলতে হবে। রায়ত হয়ে রাজার মান।

সন্দল সিং এসব বিরুদ্ধতার কথা অবগত ছিল ; তবে ভাবখানা এমন ধরিত যেন কিছুই জানে না। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কয়, সুখে-দুঃখে বুক দিয়া পড়ে,—কোন নালিশ কাহারও বিরুদ্ধে তাহার নাই। একদিন কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

শীতের রাত। শীত বেশ চাপিয়া পড়িয়াছে। ক্ষেতের কাজকর্ম্ম প্রায় শেষ। মুখিযার বৈঠকখানায মজলিস বসিয়াছিল। গ্রামের সব মাতব্বরই উপস্থিত ছিলেন। হুঁকা হাতে হাতে ফিরিতেছে ; চিলিম ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। এ-কথা সে-কথার পর সন্দল সিং-এর প্রসঙ্গ উঠিল। সন্দল সিং-এর উপস্থিতিতে কেহ মুখ ফুটিয়া ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিত না। মুখিয়া মনের জ্বালা ক্রুর হাসিতে যথাসম্ভব ঢাকিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবান লোক তো সন্দল সিং। যেখানে যাও, ওর নাম। আমি তো শুধু নামেই প্রধান। আমাকে চেনে কে ?"

খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে লম্বরদার বলিলেন—"আরে ভাই, যদি সন্দল সিং-এর নাম বাড়ে, তবে আমাদেরই নাম। সে তো আর পর নয়। ধন দৌলত যেমন, মানও তেমনি বরাতের কথা।"

দ্বিতীয় লম্বরদার ধনের প্রসঙ্গে এক টিপ্পনী কাটিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় বহু টাকা গভর্ণমেণ্টকে দান করিয়া রায়সাহেব হইয়াছিলেন কিন্তু স্বভাবের গুণে লোকে তার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। তিনি বলিলেন—"কত ধনী নাম কিনবার আশায় লাখ লাখ খরচ করে ফতুর হয়েও যেই সেই। সন্দলের ভাগ্য এমনি যে বিনি পয়সায় লাখপতিকে হারিয়ে দিয়েছে।"

মুখিয়া আর এক পোছ ভার্নিস লাগাইতে লাগাইতে বলিলেন, "সন্দল সিং-এর কাছ থেকে নি-খরচায় নাম করার রহস্যটা শিখতে হয়।"

ঝিঙ্গা চৌধুরী চুপচাপ এক কোণে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে সব শুনিতেছিল। সন্দল সিং-এর বিরুদ্ধে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মন্দ লাগিতেছিল না, তবে তাহার আশ মিটিতেছিল না। এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিবার দরকার কি? জুতা মারিতে গিয়া মখমলে মুড়িয়া মারিতে হইবে না কি? নির্ধন চাষী হইয়া যে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অনধিকার চর্চ্চার শাস্তি এত সুকোমল হইলে চলিবে কেন?

সন্দল সিং চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল। প্রশংসার পাতে মোড়া বিষ জর্জ্জর ঈর্ষাকে চিনিতে তাহার ভুল হয় নাই। এই ভাবে রাত দশটা বাজিয়া গেল। সন্দল সিং যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে। যখন সকলে আসর ভাঙিবার উদ্যোগ করিতেছে, সন্দল করজোড়ে বলিল,—"আপনারা সকলে আর একটু বসুন।" বলিয়া জঙ্গুর দিকে ফিরিয়া বলিল—"নাপ্‌তের পো, মুখিয়াজীর বাড়ী একবার হয়ে এসো। বলবে জন সাতেক অতিথ এসেছেন। খাবার তৈরী চাই। আর শোন। মোকদ্দমায় যে সত্য বলে তার হয় হার। পঞ্চের সামনে যে মিথ্যা বলে, তার হয় পরম সর্ব্বনাশ! এই কথা মনে রেখে, মুখিয়ানী যা বলেন, ঠিক ঠিক এসে বলবে।"

জঙ্গু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। আসরের অন্য সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওযি করিতে লাগিল। সন্দলের মতলবখানা কি? সন্দলের দিকে সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে পড়িল। দৃষ্টিতে প্রশ্ন বুঝিয়া সন্দল বলিল—"আপনারা রোজ জানতে চান, এ অধীনের এত নাম কেন? জঙ্গু তার জবাব এনে দেবে।"

কূট বুদ্ধি মাতব্বরগণের শকুনি-দৃষ্টি সন্দলের মুখে রহস্য ভেদের সঙ্কেত খুঁজিযা ফিরিতে লাগিল কিন্তু অভেদ্য সে আবরণ। সন্দলের মুখে কোন

ভাব পরিবর্তন নাই। কৌতূহল প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

জঙ্গু ফিরিল।

মুখিয়ানী বলেছেন—"অতিথ এসেছেন তো কেতাথ করেছেন আমায়। সারাদিন আগুন-তাতে পুড়ে কোথায এখন একটু জিরোব, না অতিথ এসেছেন। আবার গিয়ে পিণ্ডি চটকাতে হবে। মুখিয়াকে বলগে যা নিজে এসে সেঁকে দিক খানকয়েক টিক্কর। আমাকে তো মুখিয়াগিরি করতে হবে না যে দশের কাছে সুনাম কুড়িয়ে ফিরতে হবে।"

জঙ্গু এবার সন্দলের অনুরোধে প্রথম লম্বরদারের গৃহে গেল। মিনিট পনেরোর অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পর ফিরিল। লম্বরদারনী বলেছেন, "আদ্ধেক রাত কাবার হয়ে এল। বনের শেযালগুলোও শুয়ে পড়েছে; শুধু লম্বরদারের অতিথি মহাপ্রভুদের চোখেই ঘুম নেই। এখনও রাস্তায রাস্তায় টহল দিচ্ছেন বিনি পয়সায় পেট পুরাবার ফিকিরে। যত সব আপদ সব কি আমারই কপালে? বলবি ওবেলার পাঁচ ছ'খানা শুখনো রুটি রয়েছে। খায় তো খাক। তরকারী-টরকারী কিছু নেই! নুন লঙ্কা দিয়ে পারে তো খাক।"

দ্বিতীয় লম্বরদারের ঘর হইতেও জঙ্গু আশানুরূপ মধুর বচনরাশি বহিয়া আনিল—"কথায় বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। ঘরে নেই অন্নের একটি দানা, বাবুসাহেব অতিথ নিয়ে আসছেন ফৌজ কে ফোজ। বলবি দুধ আছে কিছু। আধ আধ বাটি খাইয়ে দিক।"

সন্দল সিং বলিল—"জঙ্গু ভাই, আর একটিবার শুধু। আমার ঘরে যা। বলবি ভিন্ দেশ থেকে অতিথ এসেছেন। বেশী রাত হয়ে গেছে বলে মুখিয়াজী ওদের খাওয়া দাওয়ার কথা বলেননি। ঘরে কি কিছু দুধ হবে?"

জঙ্গু এবার বড় তাড়াতাড়ি ফিরিল। এক হাতে এক দলা তামাক, অন্য হাতে দু'খানা ঘুটে।

—"চৌধুরানী কি বললেন জঙ্গু?"

—"বলবি, অতিথ দেবতার সমান। না খেয়ে থাকলে অধর্ম্ম হবে। একটু পরেই যেন সকলকে নিয়ে আসেন! আমি এখুনি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। তৎক্ষণে এই তামাকে নিয়ে যা, আর ঘুটে। চিলিম সাজিয়ে দিবি।

সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থেরা লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না।

সতীসাধ্বী অতিথি-পরায়ণা গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণে সন্দল সিং আজও লোকের স্মৃতিতে অমর।

এক পরণাম কে ওয়াস্তে *

একদা এক সংসার-বিরাগী যতী মাত্র একখানা কৌপীন কে ওয়াস্তে যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; আমাদের ব্যোমকেশ বর্ম্মণ ওরফে বেয়াড়া বর্ম্মণ ওরফে খপ্পী উস্তাদ এক পরণাম কে ওয়াস্তে যোগ ও ভোগ দুই-ই এক কোপে হারাইল। তাহা হইলে গোড়া হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

বার বৎসর আগে ব্যোমকেশ কর্ম্মের সন্ধানে পশ্চিমের দু'চারটি সহরে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করিবার পর শেষকালে একদিন বিনা টিকিটে

---

* হিন্দী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration) কালে অক্ষরের আনুরূপ্য অপেক্ষা উচ্চারণের যথাতথ্যের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

গাড়ী চাপিয়া বসিল। বিনা টিকিটে কেন? এইজন্য, যে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ বকলমা দিতে হইবে। ভাগ্যান্বেষণে যখন বাহির হইয়াছে। তখন নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া স্থান নির্ণয়পূর্ব্বক কর্ম্ম সন্ধান করা উচিত কি? কিছু পরিমাণে আত্মনির্ভরতা থাকিয়া যায় না কি? তাই সে হৃদিস্থিত হৃষিকেশের দ্বারা নিযুক্ত হইবার আধুনিক উপায় খুঁজিতেছিল। হনুমান বুক চিরিয়া রাম-সীতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন: আজকাল তো হৃদয় একেবারে হৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বুক চিরিলে উক্ত পিণ্ড ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি ছাড়া আর বড় একটা কিছু পাওযার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং হৃদিস্থিতের সন্ধানে খামোখা হয়রান না হইয়া তাঁহার বহিস্থিত কোন এজেণ্ট পাকড়াও করিতে হইবে। কয়েকদিন ধরিয়াই একমনে এজেণ্টের ধ্যান করিতেছিল; একরাত্রে ধর্ম্মশালার ছারপোকা অধ্যুষিত চার পাই হইতে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং পুঁটুলী বগলে তৎক্ষণাৎ স্টেশনের দিকে রওনা হইয়া গেল। গাড়ীর গার্ড ও টিকেট চেকার থাকিতে এজেণ্টের অভাব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালায় না বটে কিন্তু গাড়ী তো চালায়। তাহারা যেখানে নামাইয়া দিবে, সেখানেই 'যথা-নিযুক্তোঽস্মি'র উপযুক্ত ক্ষেত্র মানিতে হইবে। প্লাটফর্ম-টিকিট কাটিয়া ব্যোমকেশ অপেক্ষমান একখানা গাড়ীতে আসন গ্রহণ করিল। অল্প-ক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, ব্যোমকেশ আশান্বিত মুখে তীর্থের কাকের মত গাড়ীস্থিত হৃষীকেশের পথ চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে লাগিল। কিন্তু সেই যে বলে কাকস্য পরিবেদনা, অর্থাৎ কাকের ব্যথায় তীর্থযাত্রীর কি আসে যায়। ভাগ্য এমন বেয়াড়া বস্তু যে বিপদ যদি চাও, তবে তাহা তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষিবে না। নিরাশ চিত্তে ব্যোমকেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ এক প্রবল ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়া দেখে গাড়ী যাত্রীশূন্য; কিন্তু একের বদলে তিনজন হৃষীকেশ

হাজির হইয়াছেন, (১) গাড়ীর ঝাড়ুদার, (২) এক কুলী, (৩) একজন সন্থরা। ব্যোমকেশের টিকিট নাই বুঝিয়া তাহারা একজন চেকার ডাকিয়া আনিল। চেকার পকেট হইতে রসিদ বহি বাহির করিতে করিতে বলিল, "নিকালো কিরায়া। আউর জুর্ম্মানা ভী।"

ব্যোমকেশের হঠাৎ এক বুদ্ধি জোগাইল। এদিকে তো হৃষীকেশ নিরাশ করিয়াছেন, দ্বিতীয় ফাঁদে পা দিতেও পারেন। যেন তেন করিয়া ঘটনা পরম্পরার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া চাইই। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার এক প্রাক্তন অধ্যাপকের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "টাকা আছে, তবে দিবে না।"

এইবার চালাকি সফল। সন্থরা তাহাকে স্টেশন হইতে সোজা শ্রীমন্দিরে নিয়া তুলিল। তারপর···নাঃ এত গোড়ায় আরম্ভ করিয়া ভাল করি নাই। এইখানে সিনেমার ধরনে এক বিরাট কাট না দিলে নয়।

স্থান উত্তর-পশ্চিমের সেই হৃষীকেশ পন্থায় নির্ব্বাচিত নাতিক্ষুদ্র সহর। সময় যাহাকে বলে একেবারে সময়ের সার অর্থাৎ বর্ত্তমান। হৃষীকেশ পর্ব্বের পর নানা অবস্থান্তরের মধ্যে দিয়া পুরা একযুগ কাটিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ শেষ পর্য্যন্ত প্রাইভেট টুইশানিকেই জীবিকা করিয়াছিল। যে অল্প সংখ্যক বাঙালী ওখানে আছেন, তাঁহারা তাহার খাপছাড়া চালচলন, কথাবার্ত্তা ও বদ মেজাজের জন্য তাহাকে বেয়াড়া বর্ম্মণ আখ্যা দিয়াছেন। নামকরণে অবাঙালীরাও পিছনে পড়িয়া নাই। তাহাদের মধ্যে ব্যোমকেশ খপ্পী উস্তাদ নামে পরিচিত।

বার বৎসরে খপ্পী উস্তাদের শিষ্য-শিষ্যার এক বিরাট বাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে জনকয়েক মোহন্তও আছেন। সবই উদাসীন সম্প্রদায়ের। উত্তর পশ্চিমে উদাসী সাধুদের অন্যূন দুই হাজার দেবস্থান,

মঠ, মন্দির, দরবার, আখাড়া ইত্যাদি আছে। প্রত্যেক জায়গায় একজন করিয়া সেবাইত থাকেন—যাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য সম্প্রদায় ভুক্ত রম্‌তা সাধুদের ভরণপোষণ। আজকাল ইহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে ; জমীদারী মহাজনী, মামলা মোকদ্দমা ও অন্য অনেক 'অনির্ব্বচনীয়' কার্য্যেই ইহাদের দিন কাটে। উদাসীনদের মধ্যে, কি জানি কেন, সত্যকার ধর্ম্মপিপাসু এমনিতেই কম। মোহন্তগণ তো সম্পূর্ণভাবে ভোগমত্ত গৃহী। তবে অধিকাংশকেই অবিবাহিত থাকিতে হয় এবং নানা অর্থহীন নিত্যক্রিয়া কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতে হয়।

সাধারণতঃ মোহন্তগণ নিজ নিজ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন অর্থাৎ কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিয়া যান। অশিষ্যক অবস্থায় দেহপাত হইলে সাধুমণ্ডলী পরবর্তী স্থানধারী নির্ব্বাচন করেন। কোন মোহন্ত পরলোক-গমন করিলে, তাহার স্থলবর্ত্তীর অভিষেক খুব ঘটা করিয়াই হয়। যত বিত্তশালী মঠ, নব মঠাধীশের অভিষেকে তত বেশী সমারোহ। বক্ষ্যমান ঘটনার সূত্রপাত হয় ব্যোমকেশের শেষতম মোহন্ত ছাত্রের অভিষেক কাল।

এই ছাত্রটির ইতিহাস একাধিক কারণে চমকপ্রদ। তিন লাখ টাকা আয়ের যে গুরুদরবারে বড় মোহন্তজীর দেহাবসানে সে সদ্য গুরু পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে, এখানেই দশবৎসর আগে সে ছিল ৪০।৫০ জন আশ্রিত ছাত্রের অন্যতম। দরবার হইতে অন্য অনেক দরিদ্র ছাত্রের সঙ্গে অন্ন বস্ত্র ও স্কুলের ফীস দান লইয়া পড়াশোনা করিত। এই অবস্থায় একদিন স্বর্গত মোহন্তের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে। বাকী জীবন সে ভুড়ি, দাড়ী সোনার বালা ও যাত্রার দলের ধরনের পোশাক পরিয়া, দুধ পুকুরে, ঘৃত কুণ্ডে নাহিয়া এবং কৃপাপ্রত্যাশীদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ ও প্রচুর পদধূলি বিতরণ করিয়া কাটাইতে পারিত। কিন্তু মোহন্ত সমাজে

অঘটন ঘটাইয়া, সকলের বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রের সামনেই সে জোঁকের মত যুঙ্গী পুঁথি আকড়াইয়া রহিল এবং স্বচেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ফেলিল। তখন কর্ত্তারা কৃপা ও কৌতূহলপরবশ হইয়া ব্যোমকেশকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের হাতে প্রাইভেটে ইণ্টার পাশ করিয়া সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিল। এবং সকলকে আর এক প্রস্থ হতভম্ব করিয়া দিয়া কিছুদিন পরে আগষ্ট আন্দোলনের বিদ্যুৎ প্রবাহে ভাসিয়া জেলে গিয়া উঠিল। কমলার কৃপায় কালেভদ্রে দু'একজন কাঙালীচরণকে মহারাজ কুবের চন্দ হইতে দেখা যায়। কিন্তু এমন ভাবে অযত্নপ্রাপ্ত হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতে বড় একটা কেহ দেখে নাই। এই সব গুরুদরবার এমন কঠিন নিগড়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে বাঁধা যে এই দৈত্যকুলোদ্ভব প্রহ্লাদটি কারা প্রাচীরের অন্তরালে থাকিতেই তাহার রাজ্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইযাছিল। শেষ পর্য্যন্ত কেন যে তাহা ঘটিল না ইহা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যাই হোক ভাগ্যলক্ষ্মী বীরকে ত্যাগ করিলেন না। বৎসর কাল অবরুদ্ধ থাকিয়া সে মুক্তি পাইয়াছিল। তারপর তিন বৎসরে এম. এ. পাশ করিয়া ফিরিয়াছে। আইন পরীক্ষা দিতে দিতেই বড় মহারাজ দেহ রাখিলেন। তাহার এক মাসের মধ্যেই তাহার রাজ-তিলক হইল।

ছাত্রগর্ব্বে ব্যোমকেশের অন্তর পূর্ণ। হতদরিদ্র বালকের মনে এই যে দেশাত্মবোধ ধনলোভের উপর জয়ী হইল—ইহাতে সে পরম আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে। সে ভাবে ইহাতে তাহার কিছু না কিছু হাত আছেই।

তবু সে অভিষেকের দিন শিষ্য প্রবরের সম্মুখীন হইবার সাহস পায় নাই। সামনে গেলেই পরম্পরাগত প্রথানুসারে অন্য সকলের সঙ্গে স্বীয় ছাত্রের পাদ বন্দনা করিয়া ভেট দিতে হইত। ভেট সে লইয়াও গিয়া-

ছিল ; একজোড়া খদ্দরের ধুতি। কিন্তু পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করার কল্পনায় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অমনি ফিরিয়া আসিল। দু'চার দিন পরে যখন ভীড় থাকিবে না, তখন এক সময় আসিয়া দিলেই হইবে।

তিনদিন পরের কথা। ভীড় অনেক কমিয়াছে! সহরের লোক-জনের যাতায়াত তেমন বেশী নাই, কিন্তু বাহির হইতে যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের ভীড়েই এতবড় বাড়ীটায় যেন পা ফেলিবার স্থান নাই। যেদিকে তাকাও, ছ' ছ' ফিট লম্বা দুশমন চেহারার ইয়া জোয়ান সব মোহন্ত ও সাধুর দল। স-জটা, নির্জটা. গৈরিকধারী, ও শ্বেতাম্বর ; কৌপীন মাত্র সম্বল, আবার লম্বসাট পটাবৃত! এখন সকলে বাক্স পেঁটরা গুছাইতেছে এবং নিজেদের পাওনা গণ্ডা, প্রণামী, ইত্যাদি লইয়া নিরন্তর কলহ কোলাহল করিতেছে। পাঞ্জাবীই বেশী।

নূতন মোহন্তকে ঘিরিয়া এত লোক বসিয়াছিল যে সহজে নিকটে পৌঁছিবার উপায় নাই। ঘরের মধ্যে এক অবর্ণনীয় সুবাস প্রবাহিত হইতেছে। বাবাজীরা ঘড়া ঘড়া লসসী (ঘোল), ঠাণ্ডাই ও সরদাই মৃৎভাণ্ড হইতে উদরভাণ্ডে ঢালিতেছেন ও তাহা দেহছিদ্রপথে বাহিরে আসিয়া স্বভাব-শুষ্ক গরম হাওয়াকে ঘর্ম্ম-সুবাসিত ও লবণাদ্র করিতেছে। পাঞ্চালবাসীরা এমনিতেই স্নান-বিমুখ। তাহার উপর সাধুত্বের কল্যাণে সব রকম নোঙরামিতে জন্মসিদ্ধ অধিকার ; সুতরাং ভূতপ্রেত ছাড়া তাহাদের পুণ্যসঙ্গ কেহ সহ্য করিতে পারে না। ব্যোমকেশ এক ঝলক দেখিয়া ও শুঁকিয়া দরজা হইতেই ফিরিতেছিল ; অমনি ভিতর হইতে কে একজন বলিল—"ইয়হী তো মাষ্টার সাহব হ্যাঁয়, জিনকে জিকৃর্ অভী অভী মহন্তজী কর রহে থে। বোলাও বোলাও, অন্দর বোলা লো।"

ব্যোমকেশ গলার আওয়াজ চিনিল। দরবারের ম্যানেজার কথা বলিতেছিলেন। লোকটি বেশ দয়ালু, পরোপকারী কিন্তু হাড়ে হাড়ে স্নব (snob)। তাই ব্যোমকেশের সঙ্গে মৌখিক ভাল বনিবনা ছিল না। আজ এই প্রকাশ্য অভ্যর্থনার বহরে সে বিস্মিত হইল। ব্যাপার কি?

ভীড়ের মধ্যে পথ হইল। ব্যোমকেশ সামনে গিয়া বসিল। নূতন মোহন্ত কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া, সকলকে বিস্মিত ও অধিকাংশকে ক্ষুব্ধ করিয়া স্বয়ং ব্যোমকেশকে নমস্কার করিলেন। ব্যোমকেশ প্রতি-নমস্কার করিয়া খদ্দর জোড়া আগাইয়া দিতেই ম্যানেজারের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। কহিলেন—"ফের ক্যা জেল ভেজওয়ানা চাঁহতে হ্যাঁয় আপ?"

মোহন্ত হাসিমুখে বলিলেন—"জানে ভী দো।"

তারপর সকলের দিকে চাহিযা—"হ্যাঁ, তো, জো মঁয় কহ্ রহা থা। আপ আগর উদাসীন সম্প্রদায় কো উঁচা উঠানা চাহতে হো, তো হমে ইন জ্যায়সে বিদ্‌ওযান কী জরুরৎ হ্যায়। ত্যাগ তপস্যা কো জানে দীজিয়ে; হমারে বীচ কোই আচ্ছা পডা লিখা আদমী ভী নহঁী হ্যায়। জমানা পলট রহা হ্যায়। আপকো চাহিয়ে কি নয়ে মহন্ত বনাতে সময় অকৃল্ সে কাম লেঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বাত ক্যা হ্যায়?"

ম্যানেজার জবাব দিলেন, "এক জগহ্ কে মোহন্তই খালি হ্যায়। উদাসীনমণ্ডলী মহন্ত চুনেঙ্গে। হমারে মহন্তজী কহ্ রহে হঁায়, আপকো চুনা জায়।"

—মুঝকো চুনা জায়? ক্যা মতলব?

—মতলব ইয়হ্ কি আপ মহন্ত বনেঁ। হয়ে কিসীকো তো বানানা হী হ্যায়। আপসে আচ্ছা কোই মিলনে কা নহঁী। আগর আপ মান

জাঁয়, তো। পর, এতরাজ ক্যা হো সকতা হ্যায়! উস আস্তান কা বিশ হাজার রুপয়ে সালানা আমদানী হ্যায়। টুইশনকে লিয়ে আপকো মারা মারা ফিরনা পড়তা হ্যায়। অব জিন্দ্‌গী ভরকে লিয়ে আরাম হী আরাম। আউর ইজ্জত কিতনী। সব আকর চরণ পুজেঙ্গে। হম আপকো লেনে কি লিয়ে তৈয়্যার হ্যাঁয। অব আপ সোচ লিজীয়ে। মগর এক বাত হ্যায়। শাদী নহী কর সকতে। অব তো ইচ্ছা নহী রহী হোগী। কাফী উমর আপকী বীত চুকী।

কেঁদো বাঘের মত একজন বাবাজী দাড়ী চুমরাইতে চুমরাইতে বলিলেন—"আউর ইচ্ছা ভী হো, তো ক্যা। শাদী কা ক্যা ঘাটা। রাখেলী রাখ লেনা।"

বলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। অন্যেরা চোখ টেপাটিপি গা টেপাটিপি করিয়া মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রাখেলী শব্দের অর্থ রক্ষিতা।

ব্যোমকেশ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসিয়া বিশ হাজারের কথাই ভাবিতে-ছিল। তাহাকে ভাবিবার সময় দিবার জন্য ম্যানেজার ততক্ষণে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনোনিবেশ করিযাছেন।

ব্যোমকেশ রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভাবিতেছিল, বিশ হাজার টাকা আয়! বার বৎসর সে দারুণ সংগ্রাম করিয়া অল্প যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, বেশী লাভের আশায় ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া তাহার সব খোয়াইয়াছে। এখন হাতে কিছু নাই, এদিকে না আছে প্রথম যৌবনের কর্ম্মশক্তি, না উৎসাহ। পরিশ্রম ইতিমধ্যেই দুঃসহ হইয়া আসিয়াছে। এখনই হাতে বাতের ব্যথা আরম্ভ হইয়াছে। দেশে ফিরিবার মত আশ্রয় নাই। বিদেশেও কোন আশ্রয় সৃষ্টি করিতে পারে নাই। জীবন সায়াহ্নে কিসের বা কাহার উপর নির্ভর করিবে, এই দুর্ভাবনা এখন হইতেই

মাথা চাগা দিয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কুল-কিনারাহীন সাগরে ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ যেন জীবন-তরণী সোনার পাহাড়ে ঠেকিয়া গেল। এইবার সকল মুস্কিল আসান। বার্দ্ধক্যের ভয় আর নাই, নিরাশ্রয় হইবার ভয় নাই।

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার জমজমাট বিস্ময়-প্রগাঢ়ভাব কিছু কমিল। তাহার স্বাভাবিক তারল্য ফিরিতে লাগিল।······কোষ্ঠিতে তাহার দৈবধন প্রাপ্তি যোগ আছে বটে। এই তো দৈবধন, অযত্নলব্ধ অতুল সম্পদ; তবে কোষ্ঠির অনেকটাই মিলে নাই। এই যেমন, সাহিত্যিক খ্যাতির কথা। আর মিলে নাই বিবাহযোগ। কোষ্ঠিতে, হাতে, মাথায় সব চিহ্ন মিলাইয়া দুই দুইটি বিবাহ হইবার কথা। অথচ এদিকে বয়স ভাটাইয়া গেল। একটিও······। এতটুকু আসিতেই ব্যোমকেশের ভাবনার নৌকায় হঠাৎ ধাক্কা লাগিল। আকস্মিক ধাক্কায় নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাংলা কথা বাহির হইয়া পড়িল, "তাহলে ঘন্টির কি হবে?"

ম্যানেজার সচকিত হইয়া বলিলেন—"ক্যা কহ্ রহে হো, বর্ম্মন-সাহ্ব।"

ব্যোমকেশ লক্ষ্য করে নাই—চেহারায় চিনিবার উপায়ও ছিল না—ভীড়ের মধ্যে একজন বাঙালী মোহন্তও আছেন। খুব দামী খদ্দর পরনে। আজকাল এইসব জরদ্গব জো হুকুম স্থান-কাল-বিস্মৃত তালকানা দলের মধ্যেও দুই একজন করিয়া যুগ-সচেতন মানুষের আবির্ভাব ঘটিতেছে। বাবাজী বহু টাকার মালিক। ত্রিশ লাখ টাকার শুধু লগ্নী কারবারই তাঁহাদের আখাড়ার আছে। জন্মস্থান বাঁকুড়ায়। একেবারে মোক্ষম স্থানেই পৌঁছাইয়া গিয়াছেন বলিতে হয়।

তিনি বলিলেন—"উস্তহ পুছ রহে হ্যায় কি ঘন্টিকা ক্যা হোগা।"

ম্যানেজার ঝুঁঝলাইয়া উঠিলেন—"ঘন্টি? ক্যায়সী ঘন্টি? ইসী লিয়ে হী তো ইনকো লোক খপ্পী বাতাতে হ্যাঁয়। ভোজন কী ঘন্টি কো সোচ রহে হো ক্যা? আজ তো দের হোগী, তিন বাজে জায়েঙ্গে।"

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—'নহী, নহী, উস্তহ বাত নহী। ম্যঁয় অব চলতা হুঁ। পাঁচ সাতদিন সোচ কর জবাব দূঙ্গা।"

সকলে বলিলেন—"হাঁ হাঁ, জরুর সোচিয়ে। কোই জল্দী নহী।"

বাঁকুড়াবাসী বাঙালী বাবাও অন্য সকলের প্রতিধ্বনি করিয়া, বাংলা হিন্দী মিশাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যা সোচে দেখুন। বিশ হাজার রুপয়ে দিল্লগী নয়। জনম ভোর পায়ের উপর পা তুলে আরাম করবেন।"

ঘন্টি হইতেছে ব্যোমকেশের এক ছাত্রীর নাম। গণিতে ভালো এম. এ. পাশ করিয়া স্বাধীন জেনানা হইয়াছে। এদেশের মেয়েদের নাম এক তাজ্জব ব্যাপার। ঘন্টির এক খুড়তুতো বোনের নাম কটোরী (অর্থাৎ বাটী)। পেস্তা বাদাম প্রভৃতি যে কোন শব্দের সঙ্গে বালা বা দেবী লাগাইয়া দাও—মেয়েলী নাম হইয়া গেল। আজকাল দু'চারটি বাংলা নাম চলিতেছে—তার ফলে মেয়ে স্কুলের প্রতি ক্লাসে অন্ততঃ আধ ডজন করিয়া শান্তি, শীলা, লীলা, সাবিত্রী ও শকুন্তলা মিলিবে। তবে বিদঘুটে নামের ত্রুটী স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য সুষমার দেহবর্ণে শতগুণ পোষাইয়া যায়। আমাদের অনুপমা, অপরাজিতা, অরুণা, অপর্ণা প্রভৃতি আহা-মরি নামের অধিকারিণীগণ স্বাস্থ্যে হাড়গিলা, বর্ণে সাক্ষাৎ রক্ষাকালীর বাচ্ছা। হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস ও পাকা পাকা বচনবিন্যাসের বহর এমন যে, মনে হয় পোড়াকাঠে জল পড়িয়াছে, আর অবিরত ধোঁয়াইতেছে।

ঘন্টি কাশ্মীরী মেয়ে। কাশ্মীরের তুলনায় কালো; তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্যে স্বাভাবিকতায় আলো। আর তাহার নামটি নেহাৎ নিরর্থক

নহে। বরং একটু বেশীই বাজে বলিতে হয়। আজকাল বড় করুণসুরে বাজিতেছে। দূরাগত মৃদু রোদনধ্বনির মত মনকে উতলা করিয়া তোলে। তাহার আকুলি-বিকুলি বিদেশী ভাষার ব্যূহ ভেদ করিয়া ব্যোমকেশের হৃদয়ের নিভৃত গহনে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিযাছে। মাতৃভাষাও বুঝি এমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না। কালই তো তাহার পত্র আসিয়াছে—যেন হৃদয়ের ক্ষতমুখে উৎসারিত শোণিত দিয়া লেখা একখানা অশ্রুকাব্য। ……"চার চার চিঠ্ঠি ম্যঁয়নে তুমকো লিখী হ্যাঁয় ; পর অরে নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়ী, আউর ক্যা ক্যা নহীঁ, লিখা নহীঁ তো লিখা হী নহীঁ ! অব ম্যঁয় ক্যা করুঁ।…"

ব্যোমকেশ বার বৎসরের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবিয়া চলিল। বার বৎসরে অন্ততঃ পাঁচবার খাটটি মায়ারূপিণীকে সে পড়াইয়াছে। এ দেশে গৃহশিক্ষককে অমুকদা বলিয়া ডাকিবার রেওয়াজ না থাকায়, কোন শিক্ষাগুরুর পক্ষেই যাহা কালে পতি পরমগুরু হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা প্রায় নাই। ব্যোমকেশের মত হাদা লোকের কথা কি ; অতিশয় ঘুঘু গুরুরাও সুবিধা করিতে পারেন না। ব্যোমকেশের তো এইসব ব্যাপারে সামান্য মাত্রও সাহস ছিল না। জীবিকার জন্য সাত ঘাটের জল খাইয়া শেষকালে সে তৃণখণ্ড আশ্রয় করিয়াছে, পাছে তাহা হস্তচ্যুত হয় এই ভয় যেন কিছুতেই যাইতে চায় না।

এ হেন মেয়ে-পূর্ণ অথচ মায়াশূন্য জীবনে ঘন্টির আবির্ভাব। ছিল আয়াসে, উভয়ের অজ্ঞাতসারেই, নিত্যনৈকট্য ক্রমে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। বালিকা ক্রমে কিশোরী হইল ; অলক্ষ্যে বয়স ও বিদ্যা বাড়িয়া চলিল : ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করিল। এখন সে পরিণত যৌবনা, পরিণত বুদ্ধি। মোদ্দা কথা এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘন্টি ব্যোমকেশের ভার লইতে প্রস্তুত। এম. এ-টা যখন হইয়া

গিয়াছে, আর কিছু না হোক, মাষ্টারণীগিরি জুটিবেই। সুতরাং আট বৎসর পূর্ব্বের ছাত্রীকে বিবাহ করিবার অপরাধে অতঃপর যদি ব্যোমকেশের আর ছাত্রী নাও জুটে, কুছপরোয়া নাই। ঘন্টি রোজগার করিবে; এখানকার পাট তুলিয়া দিয়া, অন্যত্র ঘর বাঁধিবে; এমনকি বাপের মত করাইবার ভারও সে লইবে। ব্যোমকেশ শুধু বলুক, হ্যাঁ।

হ্যাঁ, সে এখনও বলে নাই। বলি বলি করিয়াও বলে নাই। প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করার নানা ঝঞ্ঝাট তো আছেই; তাহা ছাড়া এতদিন সে ঘন্টির নিকট তাহার অতীত জীবনের একটি ব্যাপার গোপন রাখিয়াছিল। ঘন্টির আকুলতায় বিচলিত হইয়া মনস্থির করিয়া কালই তাহাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছে। যদি ঘন্টি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে আর তাহার অমত নাই। কিন্তু কোন মেয়েই যে এই পরীক্ষায় পাশ হইবে, তাহা তো মনে হয় না।

এমন সময় এই কাণ্ড। এমনিতেই সে দোমনা ছিল, এখন বিশ হাজারের বিপর্য্যয় ধাক্কায় বিবাহের নৌকা বুঝি বানচাল হয়। যাহা হউক ঘন্টির জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত সে এখন ওদিকে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

আচ্ছা, দু'দিক রক্ষা হয় না? বাঘা বাবাজী তো বলিয়াই দিয়াছেন: 'রাখেলী রাখলে না।' ঘন্টি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড় অবস্থায় পৌঁছাইতে পারিবে কি? আধুনিক যুগ-মানবগণ রেঙ্গুনের নন্দ মিস্ত্রীর মতই বিশ্ববিখ্যাত সন্দেহ নাই কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদের মতামত উহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়া গেছে।

বাড়ী আসিয়া ব্যোমকেশ রান্না করিতে বসিল। টুইশনের চাপ

থাকিলে সে তাহার নিজের উদ্ভাবিত টিনের কুকারে কাজ সারে। আর কিছু নয়, গোটা দুই তিন মাটির হাড়ী, টিনের মধ্যে জল দিয়া বসাইয়া দেয়, উপরে খাজকাটা একখানা কাঠ চাপা দেয়। মাপ মত কয়লা চুলায় দিয়া ঐ টিন চড়াইয়া যেথায় প্রয়োজন চলিয়া যায়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খাবার গরম থাকে ; তাছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুবিধা, মাটির হাড়ী মাজিবার হাঙ্গামা নাই।

এখন মে মাসের প্রথম ভাগ। টুইশন প্রায় নাই। তবু আজ এক রকমের শ্রান্তি যেন সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়াছে। তাই ক্যানেস্ত্রা-কুকার চড়াইয়া রাখিয়া সে পড়িবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তিন আলমারী ভরা বই। অধ্যয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহার ভাবনার মোড় ঘুরিয়া গেল। স্থূল সঙ্গে এতক্ষণ স্থূল বস্তুর কথাই মনে হইতেছিল ; এখন অধ্যয়ন কক্ষের সূক্ষ্ম ভাবাচ্ছন্ন আকাশ তাহার চিত্তকে ঔচিত্য অনৌচিত্য, পাপ পূণ্যের বিচারের খাতে বহাইয়া দিল। কিন্তু বেশী পড়াশোনার একই মাত্র পরিণাম। প্রতি প্রশ্নের সপক্ষে বিপক্ষে মনের ভাণ্ডারে বিস্তর কথা জমিয়া উঠে ; মনে আর কোন বিষয়েই কোনকালে দ্বিধাহীন নিঃসংশয় হইতে পারে না। এদিকে বাহিরের দৈনন্দিন ঘটনা পরম্পরা তো কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া নাই ; পণ্ডিত ভাবিতে ভাবিতে যতক্ষণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন, ততক্ষণে জগতের কর্ম্ম-প্রবাহ অনেক আগাইয়া গেছে। ফলে এই হয় যে চিন্তাশীল লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম তাহার চিন্তা বা অধ্যয়নের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া শুদ্ধ অবস্থার চাপে যন্ত্রবৎ এমনি অগ্রসর হইয়া চলে। পাপ-পূণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে যতবার ব্যোমকেশ ভাবিয়াছে, পরস্পর বিপরীত কথার ঝাকুনিতে চিন্তার চালুনীর ছিদ্রপথে সবগুলি ভাবনার দানা নিঃশেষে গলিয়া গিয়াছে।

আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সব তালগোল পাকাইয়া খেই হারাইয়া গেল। আবার সেই চিরন্তন পরিণাম : ঘটনা প্রবাহ যে দিকে নিয়া যায় যাক। কোন আদর্শকেই তো সে শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রেও যা হইবার হউক।

কিন্তু চিন্তাক্ষেত্রে যেমন অরাজকতাই হউক না কেন, ব্যোমকেশের দৈনন্দিন আচরণে একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতামত কিছুকাল হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ভাল-মন্দের মোটামুটি সন্তোষজনক একটা মাপকাঠি খুঁজিয়া পাইয়াছে। স্ত্রীপুত্র কন্যা বিষয়-আশয় প্রভৃতি নিজস্ব কোন মানসিক আশ্রয় না থাকায় এবং ধ্যান জপ প্রভৃতির দিকে ঝোঁক না থাকায়, ব্যোমকেশ যুগধর্ম্মের প্রভাবে রাষ্ট্র চিন্তাকে অবসরের সঙ্গীরূপে আশ্রয় করিযাছিল। দেশের স্বাধীনতার চিন্তা কোন প্রকার সূক্ষ্ম মানসিকতা দাবী করে না ; অথচ সব মিলাইয়া মনে একটা মহৎ আদর্শ নিষ্ঠার উত্তেজনা সব সময়ে সঞ্চার করিয়া রাখে। তার উপর আছে, বাধা নিষেধের, বিপদের আকর্ষণ। সুতরাং ইংরেজ বিরোধের মধ্যে শ্রেয় প্রেম মিলিয়া গিয়াছে এবং উভয়ে দুঃসাহসিকতার ইন্দ্রধনুবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে ও বলিতে বলিতে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন তাহার কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপারের অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ বিরোধই পুণ্য ; তাহার বিপরীত ব্যবহার অধর্ম্ম। যে ইংরেজের কোপভাজন, সে অতিশয ঘৃণিত চরিত্রের লোক হইলেও বাপের ঠাকুর। আর কিছু না হোক ইংরেজকে তো ক্ষ্যাপাইতেছে। তাহা হইলেই হইল। এই নূতন নীতির মাপকাঠিতে যত সব কুচুটে কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল প্রভৃতি আধুনিক লিঙ্গায়েতীবামাচারী ও বৌদ্ধ (Intellectual) সম্প্রদায়সমূহও তাহার কাছে পার পাইয়া যাইত। তারপরে আসিল জাতীয় জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায় আগষ্টের

বিপর্য্যয়। ঠিক একই কারণে এখন এই সব বিশ্বাসহন্তা দেশদ্রোহীদের সম্বন্ধে তাহার মনোভাব অবর্ণনীয়। পারিলে চিবাইয়া খায়।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এই মাপকাঠিতে মোহন্তগিরি মন্দ বোধ হইল না। বরং সে দেশ সেবকদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবে—অবশ্য যদি টাকা হাতে পাইয়া মাথা বিগড়াইয়া না যায়।

কিন্তু আত্মসম্মান? বিনা উপার্জ্জনে ধনের অধিকারী হওয়ার মধ্যে কোথায় যেন এক বিষম গ্লানি নিহিত আছে। তারপর ধর্ম্মাচরণের কথা। কিশোর বয়সে এক সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র নিয়াছিল কিন্তু অস্থিরচিত্ততার জন্য বেশীদিন ধ্যান জপ চালাইতে পারে নাই। তাছাড়া সাধুবাবা নিজ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের অবতারত্বখ্যাপক মন্ত্র দিয়াছিলেন—ইহা তাহার তেমন ভাল লাগে নাই। সে শুনিয়াছিল শক্তিমান সাধু ধ্যানবলে শিষ্যের ভূত ভবিষ্যৎ অবগত হইয়া তাহার অবস্থার উপযোগী মন্ত্র দেন। সে রোমাঞ্চকর কোন কিছুর আশায় ছিল। কিন্তু বাবাজী অজস্র সাকার নিরাকার দেবতা থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের দেবতাটিকে তাহার উপর চালাইয়া দিলেন।·····কিন্তু এখন যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী আপত্তিজনক এক গড্ডালিকা প্রবাহে যোগ দিতে হইবে, অর্থহীন কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম্ম নিত্য করিয়া যাইতে হইবে? এতকাল পরে আবার সেই সৌম্যমূর্ত্তি সাধুবাবার কথা মনে পড়িতে লাগিল। ধ্যানী বুদ্ধের মত তাহার প্রসন্নসুস্মিত প্রেমোদ্ভাসিত মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের অন্তস্থলে এক আবাহন ধ্বনি যেন শোনা যায়ঃ—যোগী হে যোগী হে, কে তুমি হৃদি আসনে।

নাঃ,—ব্যোমকেশ আর পারে না। চিন্তার নরক হইতে কর্ম্ম ভাল। কর্ম্মের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ইঙ্গিত আসিল তিনদিন পরে, ঘণ্টির পিতার রূপ ধরিয়া। বয়স্থ।

কন্যার প্রবল অনুরাগের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। বোধ হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিতেন, কিন্তু ব্যোমকেশের চিঠি পড়বি তো পড় একেবারে বুড়োর হাতে। ব্যোমকেশ ঘন্টিকে চিঠিপত্র বড একটা লিখিত না। এখন লিখিল তো, খোঁড়ার পা একেবারে খানায় পড়িয়া গেল। দৈবের যোগাযোগ তো একেই বলে। তিনি কাতরকণ্ঠে দীন ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মুঝে মালুম হ্যায বেটা, ঘন্টি তুম পর জান দে দেগী। উসে কিসী বাতকী পরোয়া নহী। পর ম্যঁয পিতা হোকর ক্যায়সে মেরী এক লোতী বেটী কো উনবাতোঁ কো জানতে হুযে ভী, বলিদান কর দূঁ। ম্যঁায় হাত ফ্যয়লাকর ভিখ মাংতা হূঁ বেটা, তুম উসসে নাতা তোড দো। সাল দোসালমে আপনে আপ সম্ভল জায়গী। লেকিন তুম খুদ জব তক উঁনসে মুহ্ ন মোড লোগে, তব তক উসকী নশা কাটেগী।..."

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি শুনাইতে লাগিলেন, কি করিয়া মা-মরা মেয়েকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাহার কোন ইচ্ছার, কোন আব্দারে বাধা দেন নাই, পাছে অভিমানাহত কন্যা মায়ের অভাব অনুভব করে। এ ক্ষেত্রেও তাহার জেদ জয়ী হইবে, যদি ব্যোমকেশ স্বয়ং ধর্ম্মবুদ্ধি ও নিঃস্বার্থ প্রেমবশে সরিয়া না দাঁড়ায়।

ব্যোমকেশ দ্বিধা সংশযে কাতর তো ছিলই; এখন পিতৃ সমান বৃদ্ধের অন্তরোৎসারিত আগেবধারায তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। প্রথম যৌবনে দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়বেগের সঙ্গে রোমান্সের নেশা মিলিয়া যে অন্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যাহার খরস্রোতে সমাজ, সংসার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সংযম, শালীনতা সব ভাসিয়া যায়, সেই মদনমত্ত অবস্থা ব্যোমকেশ কোনদিন অনুভব করে নাই, অথবা অজ্ঞাতসারে অনেকদিন আগে

পার হইয়া আসিয়াছে। ঘন্টির কল্যাণ হউক। সে যদি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াও স্বদেশ স্বজাতি বিস্মৃত না হয়, তবেই তাহার শিক্ষাদান সার্থক।

পিতাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার অজস্র অশ্রুজলাভিষিক্ত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্যোমকেশ স্টেশন হইতে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রি। জ্যোৎস্নাধারায় সব যেন ভিজিয়া উঠিয়াছে। বহুদিন বিস্মৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের একচরণ মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। কোথায় শুনিয়াছিল মনে নাই, শব্দগুলিও এই কিনা স্মরণ হয় না কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় শ্রুত মৃদু মঞ্জীর নিক্কণের ন্যায় সুরের রেশ অনুরণিত হইয়া চলিল :

মূর্ছিতৈব স্বপিতি বসুধা চন্দ্রিকামৃত পানাৎ।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ক্রমে ব্যোমকেশের চিত্তে এক উদার পরম বৈরাগ্যময়, শান্তিময় শ্রান্তি নামিয়া আসিল। সে যে এক সম্পত্তির মালিক হইতে যাইতেছে, ইহা আর তাহার মনে গ্লানি উৎপন্ন করিতে পারিল না ; বরং মনে হইল সে যেন সত্য সত্যই ত্যাগের পথ ধরিয়াছে।

এর পরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। একমাস পরের কথা। ব্যোমকেশ তাহার আস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কাল বুদ্ধ-পূর্ণিমায় সাধুমণ্ডলী তাহাকে গদীতে বসাইবেন। মণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন,—এখানকার পরলোকগত স্থানধারীর গুরুভাই, তাহাকে দীক্ষিত করিবেন। তিনি এখনও আসিয়া পৌছান নাই। কাল সকালে অভিষেকের প্রাক্কালে পৌঁছিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে ব্যোমকেশের কোন কৌতূহলই ছিল না। দুইশতের অধিক সাধু-সন্ত-মোহন্ত আসিয়া জুটিয়াছেন ; ব্যোমকেশের

এখনও প্রায় কাহারও সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। যাহা কিছু করণীয়, তাহা পুরোহিত ও স্থানীয় সাধুদের নির্দ্দেশক্রমে সে কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতেছিল। মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। শুধু একবার কিছু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল,—গুরুর পা ধুইয়া চরণামৃত পান করিতে হইবে শুনিয়া। তারপরে আবার সেই অবসাদগ্রস্ত অবস্থা! দুই তিন ঘণ্টার তো মামলা : এই ন্যক্কারজনক প্রহসন শেষ হইতে বেশ বিলম্ব হইবে না এই যা ভরসা।

অভিষেকের প্রভাত। রাত্রি শেষ হইবার আগেই ব্রাহ্মণ ও সাধু-মণ্ডলী তাহাকে স্নান করাইয়া মস্তক মুণ্ডন করাইয়াছেন। তারপর ধুনি জ্বলিল। এক কিনারে ব্যোমকেশের আসন, তাহার পাশেই তাহার হবু-গুরুর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদমন্ত্র পাঠ ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান চলিতে লাগিল। মধুর সঙ্গীতের মত নেশা ধরাইয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম ছন্দোবদ্ধ পদাবলী সেই নিস্তব্ধ প্রভাত সমীরণে প্রতিধ্বনিত তরঙ্গ তুলিতে লাগিল: ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভার্গোদেবস্য ধীমাহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ……

সঙ্গে সঙ্গে আর একদল গুরু "মাত্রা" পাঠ করিতেছেন :

কিসনে মুণ্ড্যা, কিন মুণ্ড্যায়া, কিসকা ভেজা নগরী আয়া, (১)
সত গুরু মুণ্ড্যা লেক মুণ্ড্যায়া, গুরুকা ভেজা নগরী আয়া (২)
চেতোঁ নগরী, তারোঁ গাঁও, সিমরোঁ অলখ্ পুরুখ্ কা নাঁও (৩)
গুরু আবনাশী খেল রচায়া, আগম নিগম কা পন্থ চলায়া (৪)

ব্যোমকেশ আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। ক্ষণপরে রব উঠিল, 'বাবাজী আগয়ে, অভী পধার রহে হ্যাঁয়।' হবন-রত সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইলেন। তিনি আসন পরিগ্রহ করিলে সকলে আবার বসিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশ সেই ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়ে,

ক্রোধে, ঘৃণায়, উত্তেজনায় তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। বাবাজী তাহার পরিচিত। যখন সে গৃহশিক্ষকরূপে অল্পদিন পূর্ব্বে গদী-প্রাপ্ত পূর্ব্বোল্লিখিত মোহন্তের সঙ্গে বাস করিত, তখন লোকটি নিজের আস্থান হায়দরাবাদ হইতে আসিয়া কখন কখন সেই গুরু-দরবারে দর্শন দিতেন। অপূর্ব্ব সুন্দর চেহারা, কিন্তু প্রাণমনোহারী সৌন্দর্য্যের অন্তরালে খল সর্পের বাস। এমন ইতর ধরনের চাটুকার ব্যোমকেশ আর কোথাও দেখে নাই। তোষামোদকে ইনি সারাজীবনের চেষ্টায় এক আর্টে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রাগের আসল কারণ অন্য। সেই সময় আর্য্য-সমাজীরা হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ চালাইতেছিলেন। ইতিহাসে এই প্রথমবার সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজ একজোট হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষায় প্রাণদানতৎপর এই বার দলকে অভিনন্দিত করিতেছে। জাতীয় জীবনের এমন সঙ্কট সময়ে ইনি দরবারে আসিয়া অনবরত বলিতেন: "আর্য্য সমাজ তো হিন্দু নহী হ্যায়। উয়ে লোক দেবতায়োঁকো নহী মানতে। আউর, হায়দরাবাদ মেঁ তো রামরাজ হ্যায়।" স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্ম্ম-দ্রোহিতা করিয়া ইনি প্রচুর পুরস্কার পাইয়াছিলেন। আর এক রকম পুরস্কার ঐ সহরের লোকেরা দিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সদ্য-স্বর্গত বড় মোহন্তজীর বাধা দানে তাহার ব্যবস্থা আর হইতে পারে নাই। তার পরে আসিল আগষ্ট আন্দোলন ও সেই ছেলেটির উহাতে যোগদান। তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে যেসব লোক চেষ্টা করিয়াছিলেন ইনি ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। শোনা যায় স্বয়ং সেই স্থান লইতে ইচ্ছুক ছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায়ই ইহাকে দেখিলে ব্যোমকেশের শরীরে জ্বালা ধরিত। আজ তো শরীর মন তাহার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, কোন কিছুই যেন আর তাহার

পক্ষে অসম্ভব মনে হইতেছে না।

ব্যোমকেশের সম্বিৎ ফিরিতেই শুনিতে পাইল, সকলে বলিতেছেন, "আপ ভী বয়ঠ জাইয়ে মহারাজ। খড়ে কিউঁ।"

হবু গুরুও কণ্ঠে মধু ঢালিয়া বলিতেছেন, "বয়ঠ জা বেটা।"

ব্যোমকেশ দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—"তো আপহী মুঝে দীক্ষিত করেঙ্গে ?"

—হাঁ বেটা।

—আউর আপকা হী পয়ের ধোকর মুঝে পীনা পড়ে গা ?

—হাঁ, ইয়হা নিজম (নিযম) হ্যায়।

—তো শুনলো সব লোগ। ম্যয় আপকো সাপসেঁ ভী গয়াবীতা নীচ সমঝতা হুঁ। আপ হমারে সামনে সে অভা নিকল জাইয়ে। ম্যয় আপকা পযের কভী নহী ছু সাকতা। জান বচানে কে লিযে ভী নহী।

সকলে বজ্রাহতবৎ এই অপূর্ব্ব স্বামী-শিষ্য সংবাদ শুনিতেছিল; মুহূর্ত্তে বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল, শত শত কণ্ঠে বজ্রগর্জ্জন উঠিল—"তুহী নিকল জা ইয়হাঁ সে, শালা ভুখা বাঙালী।"

পুলিশ উপস্থিত ছিল। ভীড়ের চাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া পথে বাহির করিয়া দিল। একবস্ত্রে নেড়া মাথায় ব্যোমকেশ স্টেশনের পথ ধরিল। আবার বিনা টিকিটেই ভ্রমণ করিতে হইবে। খবর ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। যেই তাহাকে দেখে বলে—"শালা বাঙ্গালী বড়া পাগল নিকলা। এক পরণাম কে ওয়াস্তে সব কুছ খো দিয়া।"

শেষ

॥ এই সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—১ম খণ্ড (রাশিয়া) ৪৲

ঐ —২য় খণ্ড (,,) ৩৷৹

ঐ —৩য় খণ্ড (ফরাসী) ৩৷৹

ঐ —৪র্থ খণ্ড (,,) ৩৷৹

ঐ —৬ষ্ঠ খণ্ড (জার্মানী) ৩৷৹

ঐ —৭ম ও ৮ম খণ্ড (ইংরাজী) যন্ত্রস্থ